কন্যাশিশু









জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

কন্যাশিশু -১৮

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

National Girl Child Advocacy Forum
SOS CHILDREN'S VILLAGES BANGLADESH
Good Neighbors Bangladesh
actionaid
The Hunger Project. BANGLADESH

কন্যাশিশু-১৮

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদক

ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক

নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক

নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আহসানা জামান এ্যানি

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মুদ্রণ

পিপলস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

৩৩/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-35-4958

প্রকাশক

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

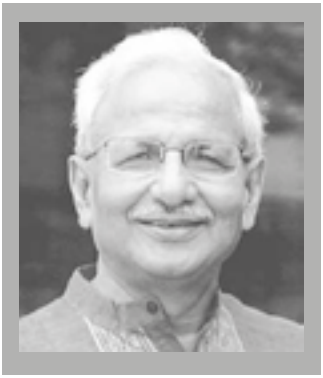
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল: ফোর), ব্লক: এ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।

ওয়েব: www.girlchildforum.org

ফেসবুক: www.facebook.com/ngcaf



ড. বদিউল আলম মজুমদার
সভাপতি
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

সম্পাদকীয়

বলা হয়, একটি সমাজ কতটা উন্নত, কিংবা অনুন্নত তা বোঝা যায় সে সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দেখে। তাই যে সমাজ যত উন্নত, সেই সমাজে নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থান তত উন্নত। উন্নত সমাজ নারীকে অগ্রাধিকার দেয়, সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করে, তাদের বিকাশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। উন্নত ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আইন-কানুনও পারিপার্শ্বিক অবস্থার নারীর অনুকূলে থাকে। কিন্তু আমরা কি সেই উন্নত সমাজ তৈরি করতে পেরেছি?

বিগত কয়েক দশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করলেও আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা এখনও অনেক নাজুক, নারী-পুরুষের বৈষম্য আজও অনেক ব্যাপক, নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি নির্যাতনের চিত্র আজও ভয়াবহ।

'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'-এর তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯৩৬ জন নারী। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৭ জন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, ২০২২ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭১৫ জন নারী, গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২২৬ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৮ জনকে এবং অ্যাসিডদগ্ধ হয়েছেন ২২ জন নারী। সবমিলিয়ে ২০২২ সালে সারাদেশে ৩ হাজার ৪৯৫ জন নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

আমাদের কন্যাশিশুদের একটি বড় অংশ এখনও পুষ্টি ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের অনেকেই বাল্যবিবাহ ও পাচারের শিকার হচ্ছে। বিনোদন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও মুক্ত চলাচল ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের কন্যাশিশুরা ছেলেশিশুদের তুলনায় এখনও বহুলাংশে পিছিয়ে।

আশার কথা হলো– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও নীতিমালা এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক বিভিন্ন সনদে কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ সরকার কন্যাশিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, কিশোরী ও নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও কন্যাশিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরফলে বেড়েছে নারী শিক্ষার হার, কমেছে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার। আমাদের নারীরা বিভিন্ন পর্যায়ে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২৫ নভেম্বর আন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস, ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য যোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত নারীদেরকে প্রদান করা হচ্ছে বেগম রোকেয়া পদক, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা পদক ও জয়িতা সম্মাননা।

জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের 'জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স' প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ২০০৬ সালে ছিল ৯১তম (১১৫টি দেশের মধ্যে), যা বর্তমানে উঠে এসেছে ৭১তম স্থানে (১৪৬টি দেশের মধ্যে)। এই প্রতিবেদন অনুসারে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বে নবম। কিন্তু নারীর এই অগ্রযাত্রা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নয়।

আমরা মনে করি, জাতির সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থেই নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি বঞ্চনা-বৈষম্য দূর হওয়া এবং শিক্ষা ও পুষ্টি-সহ তাদের প্রয়োজনীয় ও প্রাপ্য সব অধিকার নিশ্চিত করা দরকার। আর সবার আগে দরকার সর্বস্তরে নারীদের প্রতি তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কারণ নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলে, সামাজিক লিঙ্গীয় বৈষম্য দূর হলে সমাজ আপন গতিতেই বদলে যাবে, নারীরাও পাবে তাদের ন্যায্য অধিকার।

প্রসঙ্গত, কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম'। ২০০০ সাল থেকে এ ফোরাম-এর উদ্যোগে প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সচেতন মানুষ। এ বছরও 'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার' – এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয়ভাবে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হচ্ছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এসব কর্মসূচি বা দিবস উদ্‌যাপন শুধু কোনো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র নয়। বরং কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গণমানুষকে সচেতন করা এ দিবসের অন্যতম লক্ষ্য। একইসঙ্গে কন্যাশিশুদের কল্যাণে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আরও বেশি পরিমাণে কর্মসূচি গ্রহণ এবং অঙ্গীকার সৃষ্টিও এ দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমরা মনে করি, কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিককরণের সামাজিক আন্দোলনকে বিস্তৃত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো প্রকাশনা। এমন অনুধাবন থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেশের ২৫ জন খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে 'কন্যাশিশু-১৮' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রকাশনা। প্রকাশনায় স্থান পাওয়া প্রবন্ধসমূহে লেখকগণ নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি জাতির সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ করে তাঁরা বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পাচার-সহ বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার কারণ এবং এগুলো বন্ধের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করেছেন।

পূর্বের ন্যায় এবারও নিবন্ধসমূহ লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি বাংলা বানান–অভিধান' অনুসরণ করা হয়েছে।

সংকলনটির জন্য নিবন্ধ সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সদস্য ও কার্য-নির্বাহী কমিটির তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কন্যাশিশুদের জন্য একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় যাঁরা তাদের মূল্যবান নিবন্ধ পাঠিয়ে সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

আমার বিশ্বাস, 'কন্যাশিশু-১৮' প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত মূল্যবান দিক-নির্দেশনামূলক লেখাগুলো কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও অর্থবহ ও বেগবান করবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সূচিপত্র

অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া	❖ কন্যাশিশুর প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি মৌলিক অধিকার	০৯
এম মাঈনউদ্দিন মইনুল	❖ মাসিকের দিনগুলো হোক মর্যাদার	১৪
ড. আলেয়া পারভীন	❖ উদ্যোক্তা হতে বয়স কোনো বাধা নয়	১৮
ড. লাফিফা জামাল	❖ প্রযুক্তিক্ষেত্রে চাই লিঙ্গ সমতা	২০
ড. শাহনাজ পারভীন	❖ আমাদের কন্যাশিশু: আমাদের ভবিষ্যৎ	২৪
তাহমিনা আক্তার	❖ 'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার'	২৯
নাছিমা আক্তার জলি	❖ শিশু পর্নোগ্রাফি ও সাইবার বুলিং: নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন আইনের প্রয়োগ ও নাগরিক সচেতনতা	৩১
নুসরাত জাহান শাওন	❖ কন্যাশিশুর সুরক্ষা ও অধিকার: প্রতিশ্রুতি ও পরিস্থিতির ব্যবধান	৩৭
ফওজিয়া মোসলেম	❖ কন্যাশিশুর ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রয়োজন লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা	৪০
ফরিদা আকতার	❖ যৌন নির্যাতন রোধে করণীয়	৪৪
ফরিদা ইয়াসমিন	❖ যোগ্যতা ও মানসিক দৃঢ়তায় নারীর মুক্তি	৪৯
ফরিদা ইয়াসমিন	❖ পেশাগত আদর্শে শিশু জিজ্ঞাসাবাদ ও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার	৫১
ফাতিমা পারভীন	❖ কন্যাসন্তান সৌভাগ্যের নিদর্শন	৬০
বিভুরঞ্জন সরকার	❖ নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আগে বদলাতে হবে	৬৩
মনজু আরা বেগম	❖ নারী উন্নয়ন বনাম নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা	৭০
মনিকা বিশ্বাস	❖ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: শিশুদের অধিকারের ঝুঁকি	৭৪

মাসুমা বিল্লাহ	❖ প্রযুক্তির বিভাজন কিশোরীর জন্য বৈষম্য	৭৯
মো. তানজিমুল ইসলাম	❖ তবুও নারীরা আমাদের প্রেরণা যোগায়	৮২
মৌলি আজাদ	❖ কন্যাশিশু বিকাশের দায়িত্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের	৮৮
লাভলী মানসী দাজেল	❖ গারো কন্যাদের আশীষ	৯১
শাওন মাহমুদ	❖ বাঁধন বিরাম	৯৬
শান্তা মারিয়া	❖ কন্যাশিশুকে আত্মমর্যাদার পাঠ দিন	৯৯
শাহনাজ মুন্নী	❖ সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তন হলে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে	১০২
শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী	❖ ক্রমবর্ধমান অ্যাসিড-সন্ত্রাস: হুমকির মুখে আমাদের নারী ও কন্যাশিশুরা	১০৫
স্বাতী চৌধুরী	❖ কিশোরী কন্যার বিবাহ এবং আমাদের সামাজিক ভাবনার ভুলভুলাইয়া	১০৯

বিনিয়োগে অগ্রাধিকার
কন্যাশিশুর অধিকার











অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া *

কন্যাশিশুর প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি মৌলিক অধিকার

“মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সে জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে।... তাই ‘আপনাকে জানো’ এই কথাটা শেষ কথা নয়, ‘আপনাকে জানাও’ এটাও খুব বড়ো কথা।”– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পটভূমি চিকিৎসক বললেন, ‘এই বাচ্চাটি আর কখনোই ভালো হবে না, আমাদের আর কিছুই করার নেই, বাড়ি নিয়ে যান। এটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়ে হলেও প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসা নেই, আপনার মেয়ে হলেও চিকিৎসা নেই!’

মা জানতে চাইলেন, ‘এরপর কী হবে?’

নার্স বললেন, ‘ধীরে ধীরে ওর অবস্থা আরও খারাপ হবে, আপনি আল্লাহ! আল্লাহ! করেন!’

স্বাস্থ্যকর্মী তো বাড়ি নিয়ে যান বলেই খালাস। কিন্তু অভিভাবক বাচ্চাটিকে বাসায় এনে কী করবেন? কীভাবে এর পরের বাচ্চার ভোগান্তিগুলো সামাল দিবেন? সেই ব্যাকরণ কি সম্মানিত স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মীবৃন্দ বাচ্চাটি ও পরিবারটিকে শিখিয়ে পাঠিয়েছেন?

আলোচ্য প্রবন্ধে নিরাময় অযোগ্য, জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত কন্যাশিশুও তার পরিবারের ভোগান্তি নিয়ে আলোকপাত করবো। কন্যাশিশুর মৌলিক স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে আমরা কি নিরাময় অযোগ্য শিশুগুলোকে দেখেও দেখছি না? অন্তত তাদের কথা একবার হলেও আলোচনায় উঠে আসার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। ঠিক সেই জায়গা থেকেই কন্যাসন্তানের অধিকার নিশ্চিত করতে কন্যাসন্তানদের পারিপার্শ্বিক বোঝাটা খুব প্রয়োজন।

*** চিকিৎসক, কাউন্সিলর, সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার বাংলাদেশ**

কেন কন্যার জন্ম?

মানব ভ্রূণ প্রথম সাত সপ্তাহ নারী বা পুরুষ হিসেবে বিভাজিত হয় না। সাত সপ্তাহ পরে ওয়াই ক্রোমোজোমের উপস্থিতি পুরুষ নারীর বিভাজন তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

বৈশ্বিক চালচিত্রে ২০২৩ সালে দেখা গেছে, জন্মের সময় নারী পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান; এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হচ্ছে জন্মের সময় নারী ও পুরুষ শিশুর অনুপাত ওই দেশে নারী পুরুষের অসম্যতার একটি নির্দেশক। যদিও ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাপিয়ে কিছুটা বেড়েছে।

বাংলাদেশে জন্মের সময় থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেশিশু এবং মেয়েশিশু কাছাকাছি অনুপাত প্রতিফলন করে। ১৫ বছরের নিচে ছেলেশিশুদের তুলনায় মেয়েশিশুদের সংখ্যা কিছুটা কম হলেও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ (৫০.৬) এবং নারীর (৪৯.৪) আনুপাতিক হারে উল্টো চিত্র দেখা যায়।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার কী?

নিরাময় অযোগ্য, জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত রোগীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ যত্নই প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবা। যেটা প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি, 'আর কিছু করার নেই, বাড়িতে নিয়ে যান।' শুধু তাই নয়, রোগীর পরিবারের যত্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই শাখাটি করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রস আধানোম বলেছিলেন, "Palliative Care is the best kept secret in medical science!"

প্যালিয়েটিভ সেবায় বিশ্বে বর্তমান অবস্থা

বিশ্বে প্রায় ৬ কোটি লোকের প্রশমন সেবা প্রয়োজন। এর মধ্যে ৭৬ শতাংশ মানুষের বসবাস মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশে। বৈশ্বিক চালচিত্রে কেবল ১৪ শতাংশ মানুষ এই সেবাটি পেয়ে থাকেন। বিশ্বের এই চিত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের চিত্রও অভিন্ন। কিছু কিছু উদ্যোগ বাংলাদেশে থাকলেও এই সেবার ব্যাপ্তি খুবই নগণ্য।

প্যালিয়েটিভ সেবায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা

২০১৫ সালে ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'The Economist'-এ মৃত্যুর গুণগত মান নিয়ে বিশ্বে ৮০টি দেশে একটি গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হয়, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৯তম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গুণগত মৃত্যুর সূচকে আমাদের পরিস্থিতি।

২০১৪ সালের ২৪ মে তারিখে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র আয়োজনে ওয়ার্ল্ড হেলথ এলায়েন্স ৬৭.১৯ শিরোনামে একটি রেজোলুউশনে বাংলাদেশের

পক্ষে স্বাক্ষর করেন। যেখানে বলা হয় 'জীবন জুড়ে ব্যাপক সেবার একটি উপাদান হিসেবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবাকে শক্তিশালী করা।'

'বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, ২০২১' এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রশমন সেবা প্রয়োজন প্রায় ৮ লাখ ১৫ হাজার ৫১২ জনের। এর মধ্যে শিশুপ্রায় ৭০ হাজার ৭১২ জন এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৮০ জন। ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে প্যালিয়েটিভ কেয়ার উন্নয়ন শ্রেণিকরণে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয় স্তরে। এই চিকিৎসা ব্যবস্থার সিংহভাগ ঢাকাকেন্দ্রিক।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং কন্যাশিশু...

কিন্তু বৈশ্বিক মানদণ্ডে নিরাময় অযোগ্য, জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত কন্যাশিশুর সংখ্যা কত সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশেও এ ধরনের কোনো উপাত্ত নেই।

এবার ভিন্ন দিকে দৃষ্টি ঘোরাই। পৃথিবীর মোট ভূ-সম্পত্তির ২০ ভাগের ও কম মালিকানা নারীদের। কখনো সমাজ, কখনো ধর্ম, নারীর সম্পত্তি মালিকানার অধিকার খর্ব করেছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠছে, যে সম্পত্তির মালিকানা ভবিষ্যতে পাবে না তার জীবন সীমিত রোগের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার মান (আদতে অধিকার) যে সম্পত্তি পাবে তার তুলনায় কতটুকু কমবে?

কেস স্টাডি 'ক'

কিশোরী 'ক' কড়াইল বস্তি নিবাসী। 'ক' এর মা পাশেই গুলশানের এক বিত্তশালীর গৃহপরিচারিকা। যিনি আধুনিক জীবনের সমস্ত সুবিধাগুলো ব্যবহারের নিয়ম জানেন, কিন্তু ভোগ করবার অধিকার রাখেন না। কড়াইল বস্তিতে 'ক' এর মায়ের চিকিৎসকের কাছে শুধু একটাই দাবি মেয়েকে কি জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন দেওয়া যায়? কারণ জীবন সীমিত, নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত এই শিশুটিকে রেখে পেটের তাগিদে মাকে দিনভর পরিশ্রম করতে হয় বাইরে। শিশুটি কি যৌন নির্যাতনের শিকার হবে ওনার অবর্তমানে?

কেস স্টাডি 'খ'

কিশোরী 'খ' গুলশান নিবাসী। চার হাত পা নড়াতে পারে না। 'খ'-এর পুরো পরিবার বিদেশে অভিবাসিত হচ্ছে। বাবা'র একটাই চিন্তা, জীবন সীমিত, নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত এই শিশুটি সেবাকর্মী বা গৃহকর্মী দ্বারা কি যৌন নির্যাতনের শিকার হবে ওনার অবর্তমানে?

কী খেয়াল করবো? খেয়াল করলে দেখা যাবে পরিবারের পুরুষ সদস্যটি

উপার্জনক্ষম বা সম্পত্তির মালিক বিধায় যতটুকু চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য হাসপাতালে আনা হয়, নারী সদস্যরা সমপরিমাণ অসুস্থতায় সেই সেবাটুকু পান না। ঠিক একই বৈষম্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কন্যাশিশু, ট্রান্সজেন্ডার অথবা ইন্টার সেক্স কন্যাশিশু, প্রান্তিক কন্যাশিশুদের জন্য প্রযোজ্য। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, সেক্স চেঞ্জ সার্জারিতে মেয়ে বাচ্চাকে ছেলেতে রূপান্তর করতে বাবা-মা যতটুকু আগ্রহী ছেলে বাচ্চাকে মেয়েতে রূপান্তরিত করতে বাবা-মার সেই আগ্রহের ছিটে ফোঁটা দেখা যায় না। কেন? শুধুই কি সম্পত্তি অধিকার? নাকি আবহমান পুরুষতন্ত্রের ওপর দোষ চাপিয়ে আমাদের দায়বদ্ধতা শেষ?

এই বৈষম্যগুলো আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটছে চোখের সামনে। অথচ আমরা জানি না, আমরা কী জানি না! প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশের ঢাকাস্থ কড়াইল বস্তিতে পরিচালিত, 'মমতাময় কড়াইল' কেন্দ্রে কাজের সুবাদে এই তথ্য পর্যালোচনা এখন সময়ের দাবি বলে আমার মনে হয়েছে। যেই কন্যাশিশুরা প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জবাব পেয়ে গেছে, আর বাঁচবে না বলে, যাদের জীবন সীমিতের ঘণ্টা বেজে গেছে, তাদের বেঁচে থাকার বাকি দিনগুলোতে জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধিতে কাজ করার আওয়াজ তোলার সময় এটাই। জীবনের শেষ দিনগুলোতে বাচ্চাটি নিজে যেন একটু কম ভোগান্তির শিকার হয়ে মারা যায় সেই ভাবনা তৈরির সচেতনতা বৃদ্ধির সময় এখনই। বাংলাদেশ তার ২০২১-২৬ সালের ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানে, কর্মজীবী শিশুর সর্বনিম্ন বয়স ১৪ বছর নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে পেশাজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কী কী যা পরবর্তী জীবনে কন্যাশিশুটিকে দীর্ঘমেয়াদি নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার চারণভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে এ প্রসঙ্গে গবেষণালব্ধ তথ্য নেই।

প্যালিয়েটিভ কেয়ারের উন্নতি একটি চলমান প্রক্রিয়া

এই প্রক্রিয়ায় শুধু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। সমাজে বসবাসরত সকলে নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসলে শুধু প্যালিয়েটিভ সেবা প্রয়োজনীয় মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবে। আমাদের মতো দেশসমূহে প্যালিয়েটিভ সেবা প্রসারে সমাজভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে অটিজমের ভয়ঙ্কর ব্যাপকতায় ভুক্তভোগী কন্যাশিশুর যত্ন নিশ্চিন্তে আমরা কী করছি? আমরা এমন একটি সমাজে থাকি যেখানে শিশুকে মনে করি দামি খাবার, দামি কাপড়, দামি স্কুল আর মাঝে মাঝে বিদেশে বেড়াতে নিয়ে গেলেই সব হয়ে যায়! অথচ একটি শিশু তার মনের অনুভূতি প্রকাশে অক্ষম, কারণ আমরা শুনতে চাই না। আমরাই তাকে কথা বলার সুযোগ দিই না। আমরা মনে করি, 'ও বাচ্চা, ও কী বুঝে?' অথচ শিশুটি বড় হলেই আশা করি সে সাংঘাতিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে মতামত দেবে। ছোটবেলা থেকে যদি শিশুর মতকে আমরা সম্মান না করি, কীভাবে শিশু মত দেবে বড় হলে? এটা তো

একটি চর্চার ব্যাপার। সেই ক্ষেত্রে একটি কন্যাশিশু যে নিরাময় অযোগ্য জীবন সীমিত রোগে ভুগছে, আসলে কি তার মতের আমরা কোনো ধার ধারি?

আমাদের দেশে নিরাময় অযোগ্য, জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত কন্যাশিশুর সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। তাই এদের প্রশমন সেবার চাহিদা আরও বাড়বে। কারণ ক্রমাগত আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে। আমরা তৈরি তো সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়?

জরুরি ব্যাপার হলো নেতৃত্ব তৈরি। প্রশ্ন হলো এই নেতৃত্ব কারা দেবে? এই জায়গাটাতেই রহস্যের মূল চাবিকাঠি লুকায়িত। এই নেতৃত্ব দেবে যারা ভুক্তভোগী তারা। কেন? কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার থেকে ধার করে বলতে চাই,

'চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন

ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে।

কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে

কভূ আশীবিষে দংশেনি যারে।'

তারমানে নেতৃত্ব তৈরি করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন। ভারতের কেরালায় ইনস্টিটিউট অব প্যালিয়েটিভ মেডিসিনে (আইপিএম) প্যারালাইসিস রোগীদেরকেও দেখেছি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ের পথ বেছে নিতে। ছাতা, কলম ইত্যাদি তৈরির নানাবিধ প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেওয়া হয়। যাতে তারা নিজেকে তার পরিবার এবং সমাজের কাছে অপাংক্তেয় মনে না করে। এই ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলোর উপার্জনের পরিমাণ যাই হোক কাজেই নেতৃত্ব তৈরিতে ওই জায়গা থেকে স্পর্শ করা প্রয়োজন, যে তুমি নিরাময়ে অযোগ্য জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত হতেই পারো, তারপরও এখনো তুমি সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারো।

মৃত্যু প্রত্যেকের জীবনে ঘটবে। কিন্তু জীবনকে উদ্‌যাপন করতেও তো শিখতে হবে। স্কুল-কলেজের তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা নয়। প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে যেকোনো একটি দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিস্তারে চারটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমত, সচেতনতা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পেশাজীবীর সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ, তৃতীয়ত, দৃশ্যমান সেবা, চতুর্থত, নীতি নির্ধারণ মহলে উপস্থাপন।

আলোচ্য এই ফোরামটি যেহেতু রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ মহলে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, তাই এর সঙ্গে আমি নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি বিনীতভাবে আকর্ষণ করে বলতে চাই, কন্যাশিশু মানে শুধু একটি সুস্থ কন্যাশিশু নয়, একটি নিরাময় অযোগ্য, জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত কন্যাশিশু এবং তার পরিবারের ভোগান্তি কমানো আমাদের দায়িত্ব।



এম মাঈনউদ্দিন মইনুল*

মাসিকের দিনগুলো হোক মর্যাদার

কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে উন্নয়ন সংস্থাগুলো গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে এক প্রকার সমাজভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এ আন্দোলনের অর্জনও নেহায়েত কম নয়। ২০২৩ সালে এসে আমরা কি আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি? আমাদের কিশোরীরা কি প্রত্যাশিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাসিক চলাকালীন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে? আমাদের নারীরা কি অফিসে কিংবা বাইরে মাসিকের দিনগুলোতে একই রকমভাবে সপ্রতিভ?

উন্নত দেশের কিশোরী ও নারীরা মাসিককালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুবিধাগুলো পেলেও উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে এর চিত্র ভিন্ন। এখনো পর্যাপ্ত শিক্ষা, সচেতনতার অভাব ও কুসংস্কারের প্রভাবে কিশোরী ও নারীদের মাসিককালীন স্বাস্থ্যসুরক্ষা উপেক্ষিত। কুসংস্কারের চিত্র আবার আমরা একেক দেশে একেক রকম দেখতে পাই। প্রতিবেশি দেশ নেপালে ঋতুস্রাবকে ঘিরে চর্চা হয় নানা রকম রক্ষণশীলতা। ঋতুস্রাব চলাকালীন মেয়েদেরকে অপবিত্র মনে করা হয় (!)। এটি 'ছাউপাদি' প্রথা নামে পরিচিত। ২০০৫ সালে নেপাল সরকার এই প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করে। বাস্তব চিত্র বলে অনেক সমাজে এখনও তা প্রচলিত। এই প্রথায় ঋতুস্রাব চলাকালীন নারীদের বাড়ি থেকে দূরে একটি ঘরে রাখা হয়–এক রকম সাময়িক নির্বাসন। একটিমাত্র কাপড় পরে ৪-৬ দিন কোনো মানুষের সংস্পর্শ ছাড়া একাকী মাসিকের সময় অতিবাহিত করে অতি চঞ্চল, অনেক মিশুক মেয়েটিও। এই নির্বাসন কাটিয়ে ঘরে ফেরার প্রক্রিয়াটিও সুখকর নয়। গোমূত্র ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করে তাদের ঘরে তোলা হয়। একদম পাশের দেশ ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে অনেকটা একইরকম প্রথা বিদ্যমান। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়। মাসিক চলাকালীন মেয়েদের মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে ঘুমাতে দেওয়া, রান্না ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, টক খেতে নিষেধ করা, গাছে ওঠা, এমনকি গাছকে ছোঁয়াও বারণ করা,হাঁটা-চলা-দৌড়-ঝাঁপে নিষেধাজ্ঞা– এসব শহরাঞ্চলের জন্য আশ্চর্যের মনে হলেও গ্রামীণ জীবনে চিরচেনা চিত্র। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো

*** কান্ট্রি ডিরেক্টর, গুড নেইবারস বাংলাদেশ**

খাওয়া-দাওয়াতে বিধি-নিষেধ। মাছ-মাংস-সহ কোনো ধরনের আমিষ খাওয়া যাবে না–গন্ধ হবে (!)। মাঠে কাজ করতে গিয়ে এমন অনেক নিয়মের অভিজ্ঞতার বর্ণনা কিশোরী মেয়েদের কাছে জেনেছি, যেসবের নেই কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা। যা আমাদের কন্যাশিশু এবং নারীদের পিছিয়ে রাখছে।

বাংলাদেশের নারীরা মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে কতটুকু সচেতন?

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হাইজিন ফলোআপ সার্ভে ২০১৮ (প্রকাশের তারিখ: ডিসেম্বর, ২০২২) অনুযায়ী, বাংলাদেশে মাত্র ৫৩ শতাংশ স্কুলছাত্রী মাসিকের ব্যাপারে জানে। ৩০ শতাংশ ছাত্রী মাসিক চলাকালীন সময়ে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। ৩৪ শতাংশ কিশোরী স্কুলে মাসিকের সময় পুরানো কাপড় ব্যবহার করে। মাত্র ৬২ শতাংশ কিশোরী স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড ব্যবহার করে। স্কুলে না থাকলে বাসায় পুরানো কাপড় ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ৩৯ শতাংশ কিশোরী পুরানো কাপড় এবং ৫৬ শতাংশ কিশোরী স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে বলে জরিপে জানা যায়। এর মধ্যে ৭৯ শতাংশ কিশোরী পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে কাপড়গুলো পুনরায় ব্যবহার করে। মাত্র ২১ শতাংশ নারী ব্যবহৃত কাপড় বাইরে রোদে শুকাতে পারে। এই জরিপ থেকে বোঝা যায়, মাসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় আমাদের নারীদের সামগ্রিক দুর্দশার চিত্র। এই দেশে প্রায় ৭১ শতাংশ নারী এখনো মাসিক চলাকালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতন নন। বিষয়টি এখনো অগোচরেই রয়ে গেছে, যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়না। কিংবা প্রসঙ্গ উঠলেই অনেকে স্বস্তিবোধ করেন না। এই ট্যাবু বাংলাদেশের কিশোরী ও নারীদের মাসিককালীন সময়কে চ্যালেঞ্জের ভেতর ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মখোমুখি হচ্ছে। মাসিকের সময় অপরিচ্ছন্নতার জন্য নানা ধরনের মারাত্মক সমস্যা, যেমন ইউরিন ইনফেকশন, যোনিপথের সংক্রমণ, জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন আমাদের নারীরা। প্রায় ১১ বছর আগের করা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের ভেতর জরায়ুমুখ ক্যান্সারের অবস্থান দ্বিতীয়। ঝুঁকিতে আছেন আরও প্রায় পাঁচ কোটি নারী। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা এজেন্সির তিন বছর আগের করা গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর সাড়ে ছয় হাজারের বেশি নারী জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের মধ্যে ৯৭ শতাংশের ক্ষেত্রে রোগের কারণ মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতার অভাব।

গ্রামাঞ্চলে স্যানিটারি ন্যাপকিনের কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করাকে অপচয় অথবা বিলাসিতা মনে করা হয়, যেখানে মুঠোফোনের জন্য মাসে গড়ে ১৫০ টাকা খরচ করা স্বাভাবিক মনে করা হয়। এর প্রধান কারণ সচেতনতার অভাব। স্কুলগুলোতে এই ব্যাপারে মুক্ত আলোচনা করা হয় না। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসুরক্ষার অধ্যায়গুলো

নামমাত্র পড়ানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা মা ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করলেও মাসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে তাদের উদাসীনতা দেখা যায়।

স্যানিটারি ন্যাপকিনের যথাযথ ব্যবহার

গত এক দশকে বাণিজ্যিক প্রচারণার জের ধরে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এখানেও রয়েছে শুভঙ্করের ফাঁকি। স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর যতটা গুরুত্ব তার ছিটেফোঁটাও ন্যাপকিন ব্যবহারের সতর্কতার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। মাসিকের শেষের দিনগুলোতে একই ন্যাপকিনে কিশোরীরা কখনো কখনো ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় পার করে দেয়, যা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। স্যানিটারি ন্যাপকিন ডিসপোসালের যথাযথ ব্যবস্থা ও সচেতনতা এখন সময়ের দাবি।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মাসিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ চর্চা

স্বাস্থ্যকর মাসিক ব্যবস্থাপনার শিক্ষা, সচেতনতা ও চর্চার একটি চমৎকার শুরু হয়ে ওঠতে পারে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। বিদ্যালয়গামী কন্যাশিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদ্যালয়েই তার প্রথম মাসিকের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। আমাদের বিদ্যালয়গুলো একজন কন্যাশিশুকে তার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিকে আনন্দের করে তুলতে কতটুকু প্রস্তুত? লুকিয়ে বাসায় চলে যাওয়া এবং পরবর্তী কয়েকদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি বরং বেশি স্বস্তির করে রাখা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নত ডিসপোসাল ব্যবস্থা, প্যাড পরিবর্তন বা নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ স্পেস বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে থাকা দরকার।

বাংলাদেশে মোট কর্মজীবী মানুষের ৩২.৬৭ শতাংশ নারী। প্রতিদিন বিভিন্ন পেশায় অবদান রাখতে কর্মস্থলে উপস্থিত হচ্ছেন আট কোটি ছাপ্পান্ন লাখেরও অধিক নারী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো একই রকমভাবে মাসিকের দিনগুলোতে কর্মস্থল তার প্রতি কতটা সহায়ক? কর্মস্থলেও জরুরি উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিতকরা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। মাসিকবান্ধব ব্যবস্থা প্রয়োজন পাবলিক টয়লেট, শপিংমল, বিনোদনস্থল, রেল স্টেশন, বাস স্টেশন-সহ সকল পাবলিক স্পেসে।

প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ

এ বিষয়গুলো নিয়ে সম্মিলিতভাবে কথা বলা প্রয়োজন। সমন্বিত উদ্যোগ চাই সরকারি, বেসরকারি ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে। গ্রামে গ্রামে বাড়াতে হবে ব্যাপক পরিসরে প্রচারণা। গ্রামের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে

সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেনডিং মেশিন দেখা যায়, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এরূপ সুবিধা গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বৃহৎ পরিসরে চালু করা হলে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে উৎসাহ দানের পাশাপাশি এর বিপরীতে নিয়ম ও ঝুঁকি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানাতে হবে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশের ঝুঁকি মোকাবিলার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে আর্থিক বরাদ্দ দিতে হবে।

২০১৪ সাল থেকে 'বিশ্ব মাসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা' দিবস পালন করা হলেও সেটি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সীমিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক পরিসরে দিবসটি নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে বৃহৎ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সঙ্কোচ নয়, মাসিকের দিনগুলো হোক মর্যাদার

কিশোরী ও নারীদের মাসিকের দিনগুলো মর্যাদার করে তুলতে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আশার কথা হচ্ছে, আমরা শুরু করেছি। আসুন, পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মস্থলসহ সমাজের সকল স্তরে মাসিকবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করি। আমাদের কন্যাশিশুর মাসিকের দিনগুলো হোক মর্যাদার।



ড. আলেয়া পারভীন *

উদ্যোক্তা হতে বয়স কোনো বাধা নয়

আমি মনিরা বেগম। বয়স পঞ্চাশ এবং এ বয়সে আমি মনে করি আমি একজন সফল উদ্যোক্তা। আমি একজন শিক্ষিত নারী হওয়া সত্ত্বেও আমি এতদিন দাবি করতেই পারিনি যে সমাজ-সংসারে আমার মতের গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আমার পরিচিতজন অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমাকে সবসময় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত বা বুঝিয়ে দিত যে আমার কোনো যোগ্যতা নেই চাকরি বা আয় করার। আমার যোগ্যতা কেবল সন্তান মানুষ করা এবং সংসারের সবার সেবা করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করা এই আমিও একসময় মনে করতাম সংসারের সকলের মন জুগিয়ে চলা আর সন্তান লালন-পালন করাই বুঝি আমার প্রধান কাজ। সংসারে শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম আমার আত্মপরিচয়। তবে কোভিড-১৯ আমার চিন্তাকে আমূল পাল্টে দিয়ে আমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে শিখিয়েছে। আমায় আরও শিখিয়েছে যার মধ্যে যে ভালো গুণ বা যোগ্যতা রয়েছে তা দিয়েই সে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারে।

আমার মনে পড়ে আমি ছোটবেলা থেকেই নতুন নতুন খাবার তৈরি করতে পছন্দ করতাম। মা যখন রান্না করতেন তখন আমি পাশে বসে মায়ের রান্না দেখতাম, মাকে সাহায্য করতাম। কোভিডকালীন সংসারের সকলের জন্য নতুন নতুন খাবার তৈরি করতে করতে হোমমেড ফ্রোজেন ফুড তৈরি করে সেল করার চিন্তা আসে মাথায়। চিন্তাকে কাজে লাগাই। ধীরে ধীরে খাবারের আইটেম বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে বিক্রয়ের পরিমাণ। পরবর্তীতে একটি সমিতির আর্থিক সহায়তায় একটি ছোট খাবারের দোকানের মালিক হই। এভাবে প্রতিনিয়ত পরিশ্রমের কারণে আমার ছোট্ট দোকান হতে মোটামুটি আয় হতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে আমার আর্থিক ক্ষমতায়ন ঘটে এবং আমি আমাকে নতুন করে চিনতে শুরু করি। এখন নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে শিখেছি। সংসারে আমার মতকে উপেক্ষা করতে পারে না অনেকেই। প্রায় সকলেই আমার কাজকে সম্মান করতে বাধ্য হচ্ছে। সবাই আমার উদ্যোক্তা জীবনের প্রশংসা করছে। আমার উদ্যোক্তা জীবন স্বল্প সময়ের হলেও এতে রয়েছে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ কেবল নিজেকে নিয়েই নয়, চ্যালেঞ্জ সমাজের

*** সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা**

মানুষের প্রতি। আমি বিশ্বাস করি, নিজের সর্বস্ব দিয়ে যদি কোনো কাজ করা হয়, তবে সে কাজে সাফল্য আসবেই এবং সে কাজকে প্রত্যেকেই সম্মান দিতে বাধ্য।

যদিও অনেকেই আমাকে বলে যে মধ্যবয়সে এসে কেন আমি উদ্যোক্তা হলাম। আমার কাছে মনে হয় বয়স আসলে কোনো বাধা নয়। নিজের আত্মপরিচয় তুলে ধরা কিংবা উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে বয়স আমার ক্ষেত্রে কেবলই একটি সংখ্যা। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো কমিটমেন্ট। তবে একজন সফল উদ্যোক্তা হতে হলে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো: কঠোর পরিশ্রম করা, কাজকে উপভোগ করা, নিজের ওপর আস্থা-বিশ্বাস রাখা, লক্ষ্য অর্জনে অটল থাকা, সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করা। তবে এসকল গুণাবলি থাকলেই যে একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়া যাবে বিষয়টি এতো সহজও নয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তা হতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। পাশাপাশি জ্ঞান ও দক্ষতা থাকাও জরুরি। একটি ভালো পরিকল্পনা ও ব্যবসার জন্য ঝুঁকি নেওয়া এবং কৌশলী হওয়া এবং যেকোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া নিজের ও ব্যবসার মাঝে নতুনত্ব গ্রহণ করা, গ্রাহকের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত থাকা, ব্যবসার সঠিক হিসাব রাখা প্রভৃতি একজন ভালো উদ্যোক্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমি মনে করি, নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অপরিসীম। উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশের সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সহ বেশ কিছু মন্ত্রণালয় নারী উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সকল মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষ করে তুলছে। যেমন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা শহরে ও ৩টি উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ হাজার ৪৯০ জন নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, টুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ, ফ্যাশন ডিজাইনিং প্রশিক্ষণ, সেলসম্যান প্রশিক্ষণ, ভার্মি কম্পোস্ট প্রশিক্ষণ, বিউটিফিকেশন, ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ, টেইলারিং প্রশিক্ষণ, পোল্ট্রি অ্যান্ড বেকারি প্রশিক্ষণ, কিচেন ও ক্যাফে ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস অ্যান্ড প্রডাকশন প্রশিক্ষণ, মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ, এপিকালচার প্রশিক্ষণ, কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, ডে-কেয়ার ও কেয়ার গিভার প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। বিভিন্ন এনজিও থেকে এবং কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

কাজেই আমি মনে করি, নারীরা যদি আত্মকর্মসংস্থান তথা আত্মপরিচয় তৈরি করতে চায় বা নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে আমার পরামর্শ থাকবে নিজেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলুন এবং দক্ষতার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করুন। নিজে স্বাবলম্বী হন, পরিবার ও সমাজকে স্বাবলম্বী করুন, তা আপনি যে কোনো বয়সেরই নারী হোন না কেন।



ড. লাফিফা জামাল*

প্রযুক্তিক্ষেত্রে চাই লিঙ্গ সমতা

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি খাত হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বায়নের এই যুগে কোনো দেশকে এগিয়ে যেতে হলে, কোনো জাতিকে উন্নত করতে হলে নারীর ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই। আর নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৫ এ ২০৩০ সালের মধ্যে লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। লিঙ্গ সমতা শুধু একটি মৌলিক মানবাধিকার নয়, বরং একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও টেকসই বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি।

সারা বিশ্ব এ মুহূর্তে একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনমানকে আরও সহজতর করে দেওয়া। এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রার ও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ও পদ্ধতিগুলো মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সবকিছুই ইন্টারনেট ও ইন্টারনেটকেন্দ্রিক স্মার্ট ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, আইওটি, বিগ ডাটা, মেশিন লার্নিং, থ্রিডি প্রিন্টিং, ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ওয়্যারেবল টেকনোলজি, ব্লকচেইন এবং আরও অনেক প্রযুক্তির ব্যবহার ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মেশিন ও মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। চালকবিহীন স্ব-চালিত গাড়ি, ড্রোন, রোবট, ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন, ফিনটেক প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহৃত হচ্ছে। চতুর্থ বিপ্লবের এ ছোঁয়া শুধু প্রযুক্তি ক্ষেত্র নয়, আমাদের জীবনধারণের সকল ক্ষেত্রকেই পরিবর্তন করে দিচ্ছে। অটোমেশনের আওতায় চলে আসছে আমাদের প্রত্যেকটি খাত। বিশ্বের জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ বর্তমানে মুঠোফোন ব্যবহারকারী, ৬৪ শতাংশেরও বেশি মানুষ এখন ইন্টারনেট এর সঙ্গে

*** অধ্যাপক, রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

যুক্ত, ৫৯ শতাংশেরও বেশি মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত (তথ্যসূত্র: www.datareportal.com, জানুয়ারি ২০২৩)। ফলে সারা বিশ্বই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি নির্ভর এ যুগে আমাদের সার্টিফিকেট নির্ভর লেখাপড়া থেকে বের হয়ে আসার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষা পাসের সনদ (সার্টিফিকেট) নয়, বরং কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন, দক্ষতা ও হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতাই এখানে মেধা যাচাইয়ের মূল নিয়ামক। টেক জায়েন্ট কোম্পানি গুগল বা মাইক্রোসফট এর মতো কোম্পানি তাই পরীক্ষা পাসের সনদ নয়, বরং কাজের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা যাচাই করে সারা বিশ্ব থেকে তাদের মানবসম্পদ তৈরি করছে। তথ্য-প্রযুক্তি কর্মস্থল ও কর্মঘণ্টা সম্পর্কিত পুরানো ধারণাকে বদলে দিচ্ছে। এর বদৌলতে স্থান-কাল নির্বিশেষে প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বমানের যেকোনো প্রতিষ্ঠানে এখন কাজ করা সম্ভব।

কোভিড-১৯ মহামারি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেট প্রযুক্তির অবকাঠামো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি সংশ্লিষ্টতা আরও বেড়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সকলকে প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে লেখাপড়া করছে। তবে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারছে না। সরকারি হিসাব মতে, কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রায় ১৫ শতাংশ নারী কাজ করছেন। তার মধ্যে অধিকাংশই প্রাথমিক বা মধ্যম পর্যায়ের কাজ করেন, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অবস্থান শতকরা এক শতাংশের চেয়েও কম। শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বেই প্রকৌশল ও প্রযুক্তিখাতে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম।

জিএসএমএ, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত দ্য মোবাইল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন-২০২০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শতকরা ৮৬ শতাংশ পুরুষের মোবাইল ফোন আছে, যেখানে নারী মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬১ শতাংশ; অর্থাৎ ২৯ শতাংশ লিঙ্গবৈষম্য এখানে বিদ্যমান রয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য আরও প্রকট; যা প্রায় ৫১.৫ শতাংশ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, বাবা-মা তার পুত্রসন্তানকে প্রয়োজনে মোবাইল বা ল্যাপটপ কিনে দিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু কন্যাসন্তানের একটি নিজস্ব ডিভাইস পেতে স্বচ্ছল পরিবারেও অনেক বেগ পেতে হয়। যেসব পরিবারে একাধিক সদস্য একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে ডিভাইসটির মালিকানা থাকে বাড়ির পুরুষ সদস্যের –

পরিবারের নারী সদস্যরা প্রয়োজনে ব্যবহার করেন বাবা, স্বামী, ভাই বা পুত্রসন্তানের মোবাইল ফোন। করোনার সময়ে অনেক নারী শিক্ষার্থী এ কারণে অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হতে পারেননি। ভাই-বোন দু'জন শিক্ষার্থী থাকলে ভাইটিই অনলাইন ক্লাসে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের বাবা-মায়েরা পুত্রসন্তানের লেখাপড়া এবং ক্যারিয়ার গড়ার জন্য সঞ্চয় করেন, আর কন্যা সন্তানের 'বিয়ে দেওয়ার' জন্য থাকে আলাদা সঞ্চয়!

সেপ্টেম্বর ২০২০ এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত উইমেন'স রিপোর্ট অনলাইন রিপোর্ট কার্ড এর তথ্যমতে, অনলাইনে আমাদের দেশের শতকরা ৭৩ ভাগ নারী সহিংসতার শিকার হয়, যাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী তথাকথিত সামাজিক লোকলজ্জার কারণে কোনো ধরনের কেস রিপোর্ট করে না এবং ৬৩ শতাংশ নারী জানেনই না যে অনলাইনে সহিংসতার শিকার হলে সাহায্যের জন্য কোথায় যেতে হবে, কীভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। নারীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও অনলাইনে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যম ম্যাসেঞ্জারে। এর ফলেও অনেক বাবা-মা তার কন্যাসন্তানকে ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমতি দিতে দ্বিধা বোধ করেন। কিন্তু মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা তো সমাধান নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সকলকেই নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের কৌশল জানতে হবে। সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। আধুনিক এ বিশ্বে 'ডিজিটাল লিটারেসি' শিক্ষাসবার জন্যই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন দেশের প্রতিটি জায়গায় সুলভ মূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ। রাজধানী শহরে বসে আমরা যে গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করি, ঠিক একই গতি আমাদের হাওড় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চলসহ সাড়া দেশে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রযুক্তির বিষয়গুলো নিয়তই পরিবর্তনশীল। প্রতিদিনই আসছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। কাজেই এক্ষেত্রে কাজ করতে হলে নিজের দক্ষতাকেও সেভাবে বৃদ্ধি করতে হয়, সময় দিতে হয়ে প্রচুর, ৯টা-৫টার ডেস্কজবের ছকে একে বেঁধে রাখা যায় না – যেটাকে অনেক নারী তাদের কাজের পক্ষে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে প্রযুক্তিতে কাজ করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো অফিসের ধরা-বাঁধা সময়ের বাইরে বাড়িতে বসেও অনেক কাজ করা সম্ভব। বিশেষ করে কোভিড মহামারির সময়ে আমরা দেখেছি প্রযুক্তির কল্যাণে কর্মস্থল ও কর্মঘণ্টা এখন আর কোনো অন্তরায় নয়। চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজের সময় সুবিধামতো পরিবর্তন করে নেওয়া সম্ভব। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ঘরে বসে কাজ করেও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারেন। ই-কমার্স, এফ-কমার্স, এম-কমার্স এর আওতায় আমাদের দেশের প্রত্যন্ত

অঞ্চলের নারীরাও এখন স্বাবলম্বী হচ্ছেন। করোনাকালীন অনলাইনে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিতে মেয়েদের সংখ্যা কম হওয়ার অন্যতম কারণ আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা। এ বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয় কঠিন বিষয় হিসেবে, আর যা কিছু কঠিন তা তো মেয়েদের জন্য নয়! প্রকৌশল ও প্রযুক্তির বিষয়গুলোকে ছেলেদের বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। অথচ বিশ্বের প্রথম প্রোগ্রামার এডা লাভলেস ছিলেন একজন নারী। নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সমতা আনয়ন করতে হবে। নারীদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নারীর জন্য বিনিয়োগের পরিকল্পনা থাকতে হবে। বর্তমান সরকার প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। তবে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

আশার কথা এই যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গসমতা অর্জনে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে বাংলাদেশ (জেনেভাভিত্তিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম রিপোর্ট-২০২১ অনুযায়ী)। এক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ৭১তম। দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ৭৬তম, শ্রীলঙ্কা ১১০তম, মালদ্বীপ ১১৭তম, ভুটান ১২৬তম, ভারত ১৩৫তম, পাকিস্তান ১৪৫তম এবং আফগানিস্তান ১৪৬তম অবস্থানে আছে।

প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি নারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অবস্থান করে নিতে হবে। আত্মবিশ্বাস, নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে নারীরা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তাদের সামাজিক ও লিঙ্গ সংক্রান্ত বাধা পেরিয়ে নিজে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।



ড. শাহনাজ পারভীন*

আমাদের কন্যাশিশু: আমাদের ভবিষ্যৎ

'কন্যা সোনা, কন্যা রুপা, হীরার ঝিলিক ভাই–
কন্যা সবার জীবন খুশি তার তুলনা নাই ।'

একটি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে একজন মায়ের মমতা, যোগ্যতাও বলিষ্ঠতায় । যেই সমাজে নারী যত বেশিমানবিক বোধসম্পন্ন, যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, সেই সমাজে ততবেশি জাতির সম্মান রক্ষিত থাকে । বিশ্ব পরিমণ্ডলে সেই সমাজ, সেই দেশ, সেই রাষ্ট্র ততবেশি সম্মানের হয়ে থাকে । আমরা শিশুই বলি, নারীই বলি, আর মায়ের জাতই বলি, তার শুরুটা হচ্ছে কন্যাসন্তানের মাধ্যমে ।

'কন্যা' শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে দুহিতা, আত্মজা, তনয়া, সুতা, নন্দিনী, মেয়ে ইত্যাদি নানামুখী স্বাপ্নিক, হৃর্দ্বিক শব্দমালা ।

আমাদের আজকের নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কন্যাশিশু । আমরা জানি, কন্যাশিশু দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বজুড়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা । ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর থেকে একযোগে সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসটি পালিত হচ্ছে । সেই হিসেবে বিশ্ববাসী প্রতিবছর ১১ অক্টোবর দিবসটি পালন করে থাকে । এই দিনটি মেয়েদের দিন হিসেবেও পরিচিত । আর বাংলাদেশে ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয় ।

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের একটা থিম বা প্রতিপাদ্য থাকে । ২০২২ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল–'এখনই সময় ভবিষ্যৎ গড়ার, নিশ্চিত কর নিজের অধিকার ।' দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করা । পাশাপাশি শৈশবে কন্যাশিশুর শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও এ দিবসটির অন্যতম উদ্দেশ্য ।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল নামের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রকল্প রূপে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের জন্ম হয়েছিল । প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল 'কারণ আমি একজন মেয়ে' (Because I Am a Girl) নামক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে

*** অধ্যক্ষ, কবি, গবেষক, কথাসাহিত্যিক ও সভাপতি, দ্যোতনা সাহিত্য পরিষদ, যশোর**

এই দিবসের ধারণা জাগ্রত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচি হলো গোটা বিশ্বজুড়ে কন্যার পরিপুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই সংস্থার কানাডার কর্মচারীরা এই আন্দোলনকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে কানাডা সরকারের সহায়তা নেয়।

দিবসটি প্রথম পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কানাডা। এই দেশটিই প্রথম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রস্তাব দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়।

বাংলাদেশে এই দিবসটির গুরুত্ব অনেক। বাংলাদেশের জলবায়ু এবং পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে এই সময়টাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোর বয়সটি আমরা সবাই পেরিয়ে এসেছি এবং এখন আমাদের সন্তানরাও এবয়সটা পার করছে। এই সময়টা জটিল ও স্বল্প সময়ের সমষ্টি– যা না খুব ছোট, আবার না খুব বড়। ঝড়ের গতিতে আসা এই সময়টাতে একটি শিশুর না থাকে শিশুত্ব, আবার না থাকে যৌবনত্ব। তাদেরকে না বড়, না ছোটর দলে ফেলা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়– 'বার তের বছরের বালাই'। হঠাৎ করে এই সময়ে হরমোনের অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, যার ফলে শিশুদের শারীরিক এবং অনেক বেশি মনোজাগতিক পরিবর্তন আসে। সেই সময়টাতে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানকে ঠিকমতো বুঝতে পারেন না। তাদের কোনো স্বাভাবিক আচরণকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেন না। কিন্তু অভিভাবকদের বোঝা উচিত তারাও এই সময়টা পার করে এসেছেন। আমাদের উচিত সবসময় তাদের সঙ্গে সুন্দর ও মোলায়েম আচরণ করা, যাতে তাদের নরম মনের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি না হয়। এই সময় তাদের এতটা স্পর্শকাতর বয়স যে হঠাৎ করে তারা যে কোনো কিছু করে ফেলতে পারে। এই সময়টা তাদের পারিবারিক সাপোর্টটা খুব বেশি প্রয়োজন বলে মনে করি।

সম্প্রতি একটি কন্যাশিশুর অমানবিক মৃত্যু ও একটি চিঠি ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। মেয়েটি তার কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হতে পারেনি বলে তার বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের বৈরিতাপূর্ণ আচরণ সে মেনে নিতে পারেনি। একটি চিঠি লিখে রেখে সে আত্মহত্যা করেছে, যা নিয়ে দেশব্যাপী ঝড় উঠেছে। কিন্তু যা হবার তাতো হয়ে গেলো। কেউ ঠেকাতে পারলো না। আমরা জানি, প্রতিটি বাবা-মায়ের নিজের জীবনের সকল অপূর্ণতার পূর্ণরূপ আমরা সন্তানের মধ্যে দেখতে চাই। কেমন হবে তাদের আগামী? সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাবা-মা বাধ্য করে তা ঠিক করে দিতে চান। কোনো ক্ষেত্রে তখন বাঁধে বিপত্তি। আমরা শিশুদের মেধা, মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা, সৃজনশীলতা, রুচি, মানসিকতার কথা চিন্তা না করে নিজেদের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করি। অথচ এগুলো সৃষ্টি প্রদত্ত, একথা আমরা ভুলে যাই। মহান আল্লাহ একেকজন মানুষকে একেক রকম

মেধা এবং অবয়বে সৃষ্টি করেন। বর্তমান এ পৃথিবীর আট বিলিয়ন মানুষের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনো মিল নেই। তাই যে সন্তান যেমন মেধা, যোগ্যতা, সৃজনশীলতা এবং রুচি নিয়ে জন্মেছে তাকে সেইভাবে গড়ে তোলা উচিত। শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া মেধার পূর্ণ বিকাশে আমাদের সকলকে সহযোগিতা করা উচিত।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিশুদেরকে সেভাবে বোঝে এবং তাদের জন্য কিছু সময় বরাদ্দ রাখে। যাকে আমরা 'কোয়ালিটি টাইম' বলতে পারি। আমরা যদি কন্যাশিশুদেরকে সুন্দর পথে পরিচালিত করতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজটাও সুপথে পরিচালিত হবে। আর এই বয়সটাতে তারা যদি বিপথে পরিচালিত হয়, তাদেরকে আমরা আচরণগতভাবে বিবেচনা না করতে পারি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনোই সৎপথে পরিচালিত হতে পারবে না। এটা আমাদেরকে সবসময় ভাবতে হবে।

কন্যাশিশু দিবস পালনের মাধ্যমে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ দূর করতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণে প্রত্যেকেরই সচেতন ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। বিগত ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে মরণঘাতি করোনাভাইরাসের আঘাতের ফলে এদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কন্যাশিশু শিক্ষার্থীরা। করোনার এই সময়ে তাদের অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে গেছে। তাদের অভিভাবকের ইচ্ছায় তারা বাল্যবিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে। আমার অনেক মেধাবী ছাত্রী বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থেকে ছিটকে পড়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাল্যবিবাহ তাদের উন্নয়নের পথে সমূহ ক্ষতি করেছে।

সময় এখন পাল্টেছে। এখন আর সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত ও নির্ধারিত সিলেবাসের গদবাঁধা শিক্ষা সমাপ্তির জন্য অনেকেই বসে থাকে না। এখনকার তরুণ প্রজন্ম সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নানামুখী কারিগরি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরতে সচেষ্ট।

তিথি আমার একজন প্রিয় ছাত্রী। পড়াশোনায় সে খুব যে মেধাবী তা কিন্তু নয়। তবে সে উদ্যমী। কলেজে ভর্তি হয়েই সে পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে নানামুখী কর্মসংস্থানের পেছনে ছুটছিল। সংস্কৃতিকর্মী হওয়ার সুবাদে সমাজে সে সকলের কাছে পরিচিত মুখ। এক সময় সে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতির নানা শাখায় নিজেকে মেলে ধরার জন্য সচেষ্ট হলো। এবং এসব কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ধীরে ধীরে সে একজন প্রশিক্ষিত নারী উদ্যোক্তা হয়ে গড়ে ওঠে। উদ্যোক্তাদের জন্য পরিচালিত স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে গড়ে তোলে কুটির শিল্প বিষয়ক কয়েকটি কারখানা। সেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আজ সমাজের অনেক মেধাবী, বেকার, তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যা সত্যি বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় সুখবর। বর্তমান সময়ে নানান

কুটিরশিল্পের পাশাপাশি কন্যাশিশুরা অনলাইনে নানান পোশাক শিল্প, অনলাইনে ঘরে বসে নানান তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার, অনলাইনে খাদ্য-সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে খুব সামান্য পুঁজি নিয়েঘরে বসে তারা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিচ্ছেন। এভাবে যদি মেধাবী কন্যাসন্তানগুলো সমাজে নিজেদের নানামুখী মেধা বিকাশের সুযোগ পায়, তাহলে বাংলাদেশ এক অন্য উচ্চতায় স্থান করে নিবে।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম আয়োজিত জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা ও সচেতনতার মাধ্যমে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বর করে তোলা, কৈশোরকে ক্ষমতাসম্পন্ন ও মানবিক করে গড়ে তোলা, সমাজ থেকে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অসম আচরণ, হিংসা-বিদ্বেষ বন্ধ করাও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ও সমতা বিধান করা সম্ভব। সমাজে মেয়েদের উন্নতির লক্ষ্যে মেয়েদের ক্ষমতায়নে জরুরি সহায়তা প্রদান এবং তাদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধে পরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

বর্তমান সময়ে নবীন মায়েরা পৃথিবীর স্মরণকালের ভয়াবহ সময় অতিবাহিত করছে। একান্নবর্তী পরিবারে তারা তাদের সন্তানের তদারকির কারণে নিজেদের ক্যারিয়ারের দিকে তাকাবার ফুসরৎ পায় না। ছেলেরা হয়তো জীবন-জীবিকার তাগিদে যে কোনো কায়দায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটি? সে কোনো দোহাই তৈরি করেই বাচ্চার দেখাশোনার দায়িত্ব এড়িয়ে ক্যারিয়ার গড়তে বাইরে যেতে পারেন না।

এমনও হতে পারে, শিক্ষাজীবনে মেয়েটির ফলাফল ছেলেটির থেকে যে কোনোভাবেই এগিয়ে ছিল। কিন্তু ক্যারিয়ারের জগতে সে পিছিয়ে গেল, পিছিয়ে গেল বলছি কেনো? একেবারে হারিয়েই গেলো। প্রতিযোগিতায় তো সে নামই লেখাতে পারেনি, তো জেতা-- হারার প্রশ্ন আসছে কেনো?

তাই তো সে তার শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও 'কিছুই করে না'র দলে নাম লেখায়। অর্থনৈতিকভাবে তারা দুর্বল অবস্থানে অবস্থান করে সারাজীবন তাদেরকে পরিবারের কাছে হাত পেতে চলতে হয়। অথচ আমরা জানি, সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে অর্থনৈতিকভাবে সবল হতে হয়। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও তাদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। তাদেরকে হীনমন্যভাবে, মাথা নিচু করে সংসার যাপন করতে হয়। এ কারণে আজীবন তার ভেতরের ক্ষরণ আমরা দেখতে পাই না।

এ সমাজে কোনো কোনো যৌথ পরিবার আছে। সেই পরিবারের সদস্যরা ছেলেটির ক্যারিয়ার নিয়ে যতটা চিন্তা করে, মেয়েটির ক্যারিয়ার নিয়ে ততটাই ভ্রুক্ষেপহীন। যৌথ পরিবারের বাবা-মাসহ সবাই একসঙ্গে শহরে বসবাস করছেন। তারপরও মেয়েটি, পুত্রবধূটি সন্তানের দেখভালের জন্যই চাকরিতে ফিরে যেতে পারেন না।

এক্ষেত্রে পরিবারের সবারই সচেতন হওয়া জরুরি। তাহলেই আমরা আমাদের পরিবারকে, আমাদের দেশকে আরও এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবো।

আবার এমন কোনো একক পরিবার আছে, ছেলের বউয়ের পড়াশোনা, চাকরির জন্য নিজেরা শহরে না আসতে পারলেও সন্তানকে গ্রামে নিজের কাছে নিয়ে যায়। আমার ডাক্তার ননদের শাশুড়ি আম্মা গ্রামে নিজের বাড়িঘর, স্বামী, স্বজন ফেলে রেখে ঢাকায় বসবাস করা সম্ভব নয় বলে নাতিকে নিজের কাছে নিয়ে বড় করেছিলেন। তিনি এখন পৃথিবীতে বেঁচে নেই। কিন্তু তাহার অসামান্য অবদান ভুলিনি কেউই। তিনি বেঁচে আছেন জীবনের পরতে পরতে।

আমার (বর্তমান নিবন্ধের লেখক) কন্যাদুটি দেশের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলেও সন্তানদের দেখভালেই তারা ব্যস্ত সময় পার করছে। অন্য সবার মতো বলতে পারছি না, লিখতে পারছি না, আমার কন্যাদের ক্যারিয়ারের গল্প। তারা পরিপূর্ণ সময় নিয়ে তাদের সন্তান, সংসার সামলে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। শুধু মায়ের দায়িত্ব পালন করতেই আমাদের মেয়েদেরকে বাইরের কাজ থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। এইটা মাথায় রেখেই তাদেরকে পরিপূর্ণ সম্মান ও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তবেই তারা কিছুটা হলেও হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। সত্যিকারের ভালোবেসে তারা তাদের আগামী প্রজন্মের সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে পারবে।

সব শেষে বলি,অভিনন্দন আগামী প্রজন্মের অভিভাবক মায়েরা। তোমার তোমাদের শ্রম, মেধা এবং পরিপূর্ণ আন্তরিকতা দিয়ে সম্পূর্ণ মানবিকভাবে গড়ে তোলো তোমাদের সন্তানদেরকে। তোমাদের পরশ স্পর্শে তারা খাঁটি সোনা হোক। ভরিয়ে তুলুক আমাদের ভবিষ্যৎ আলোর পৃথিবীর প্রতিটি মুহূর্ত।



তাহমিনা আক্তার*

‘বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার’

১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। এই দিবসটি পুরো বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো প্রতিবছরপালন করে আসছে। কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্য দূর করার জন্য ২০১২ সালে ১১ অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূর করা এই দিবসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হলো শিক্ষা, চিকিৎসা, পুষ্টি, আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার, বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত থাকা এবং বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের মতো সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকা।

কন্যাসন্তানেরা প্রকৃতপক্ষে যে কোনো পিতা-মাতার জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। এ বছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– ‘বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার’, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। বাংলাদেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কন্যাশিশু। তাদের যথার্থ পরিচর্যা আমাদের সকলের দায়িত্ব। কন্যাশিশুদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, বিকাশ প্রক্রিয়া, খেলাধুলা, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়েই আমাদের আজকের কন্যাশিশুরা আগামী দিনের নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে। আমরা কন্যাশিশুদের সঙ্গে একটি সক্ষম এবং সজীব সম্পর্ক তৈরি করতে, তাদের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও সক্ষমতা বিকাশ করতে সাহায্য করতে পারি।

আমরা এখনো অনেকেই মনে করি কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ করার কোনো অর্থই নেই। তারা বড় হলে বিয়ে দিলে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে, অন্যদিকে একজন ছেলেশিশুর জন্য বিনিয়োগ করলে ওরা বড় হয়ে আয় করে খাওয়াবে। যদিও এখন বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্ক্রমের মাধ্যমে অনেক পিতা-মাতার চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। এখন সচেতন পরিবারের মেয়েরাই পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তাই কন্যাশিশুদের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করার এখনই সময়। কারণ কন্যারা শিক্ষার সুযোগ পেলে শুধু সমাজের নয়, একটি রাষ্ট্রের জন্য একজন উচ্চপদস্থ নাগরিক হতে পারে। বর্তমান সময়ে কন্যারা দেখিয়ে দিয়েছে তারা জ্ঞানার্জনে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই। আর মেয়েদের

*** কমিউনিকেশনস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অফিসার, এডুকো বাংলাদেশ**

বাদ দিয়ে কোনোভাবেই শুধু পুরুষের দ্বারা একটি পরিবার, দেশ বা সমাজের উন্নতি করা সম্ভব নয়। তাই সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য অবশ্যই কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন।

পাশাপাশি, আজকের কন্যাশিশুরাই আগামীর নারী। তারাই স্ত্রী,মা, বোন, বউয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের কন্যাশিশুদের পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার কম দেওয়া হয়। এর মূল কারণ হলো জেন্ডার বৈষম্য। ডব্লিউএফপি-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ৫০ শতাংশ কন্যাশিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ কম ওজনসম্পন্ন। এছাড়া ইউনিসেফ-এর আরেক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক কুসংস্কারের কারণে গর্ভকালীন নারীদের কম খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়, যাতে সিজার ছাড়াই নারী কম ওজনসম্পন্ন বাচ্চা প্রসব করতে পারে।

তাই কন্যাশিশুদের দেহ গঠন-বৃদ্ধির বিকাশ ইত্যাদির জন্য খাবারের মান সঠিক জরুরি। তা না হলে তারা সহজেই অপুষ্টির শিকার হবে। ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। কন্যাশিশুদের খাদ্য এমন হতে হবে, যাতে তাদের দেহের বৃদ্ধি, গঠন, ক্ষয়পূরণ, কর্ম ও মননশক্তির বিকাশ হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিশ্চিত করতে প্রচারণা, সরকারি নীতিতে এ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা, উন্নততর সেবা প্রদানের ব্যবস্থা এবং কমিউনিটির ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা আমাদেরই দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সরকার কন্যাশিশুদের সার্বিকভাবে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। যেসব এলাকাতে শিশুদের প্রতি এখনো তেমন কোনো বিনিয়োগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নেই সেসব ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলকে এখনই সোচ্চার হতে হবে। তবেই আমরা খুঁজে পাবো বৈষম্যহীন এক সমাজ।

পরিশেষে বলতে চাই, ছেলেশিশু থেকে কন্যাশিশুকে আলাদাভাবে না দেখে তাদেরকে সুশিক্ষিত করার ও মানুষ করার প্রত্যয় ধারণ করতে হবে। কন্যাশিশুর প্রতি সম-বিনিয়োগ ও নিরাপত্তার বিষয়টি পরিবার থেকেই নিশ্চিত করতে হবে। কন্যাশিশু ও নারীদের অধিকার অর্জিত হলে মানবসম্পদ উন্নয়নের সুফল পাওয়া যাবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিতকরণে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার বাড়াতে হবে।



নাছিমা আক্তার জলি*

শিশু পর্নোগ্রাফি ও সাইবার বুলিং: নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন আইনের প্রয়োগ ও নাগরিক সচেতনতা

বর্তমান বিশ্বে কালো ছায়ার মতো একটি অধ্যায় হলো পর্নোগ্রাফি ও সাইবার বুলিং। ভার্চুয়াল থেকে বাস্তব, সর্বক্ষেত্রেই এর সরব উপস্থিতি। করালগ্রাসী এই ভয়াবহতার থাবা থেকে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বস্তুত পর্নোগ্রাফি ও সাইবার বুলিংয়ের শিকার কন্যাশিশুও নারীরা। বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া গেছে ভিকটিমদের অধিকাংশের বয়সই হলো ১৪-৩০ বছরের মধ্যে। এর ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

পর্নোগ্রাফি ও সাইবার বুলিং দুটি শব্দই একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দুটিশব্দের মাধ্যমেই এমন কতগুলো নির্দেশনা বা ব্যাখ্যা তৈরি হয়, যা সুস্থ সাবলীল পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নির্দেশ করে না, বরং প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিশুরাও জড়িত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৮ কিংবা এর কম বয়সী শিশুরা যখন এই সকল কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বা শিকার হয় তখন কেবল একটি শিশুর জীবনই বিপন্ন হয় না, পুরো সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের আইনগুলোও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। আইনের ব্যবহার আইনের প্রয়োগ ইত্যাদির ওপরও মানুষের আস্থা হারিয়ে যায়।

বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ-সহ বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই ইন্টারনেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই অপব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে যৌন নির্যাতনের নতুন মাত্রা হিসেবে অনলাইনে নারী ও শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে। যেখানে প্রত্যাশা ছিল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারী ও কন্যাশিশুরা নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড চিলড্রেনের (এনসিএমসি) ২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরিতে

*** উন্নয়নকর্মী ও সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম**

পঞ্চম বাংলাদেশ। তথ্যটি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। সামগ্রিকভাবে একটি দেশ এবং জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কেবল যে এই তথ্যটি ইন্ধন যোগায় তা নয়, বরং এর মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কাও অনেক ক্ষেত্রে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

শিশু পর্নোগ্রাফি বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুকে ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি থেকে শুরু করে অডিও-ভিডিও তৈরি করা-সহ প্রচার ও সংরক্ষণ করা বা এ জাতীয় কোনো কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে বোঝায় (HA-World Law under book; volume 96)। এর ফলে একজন শিশু বিশেষ করে কন্যাশিশুরা পিছিয়ে পড়ে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে প্রায়শই ফেরার পথ রুদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে তারা শিক্ষাক থেকে বঞ্চিত হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ তাদের কাছে স্বপ্নালোকের মতো হয়ে দেখা দেয়। তাদের জীবনে নেমে আসে বিভীষিকাময় এক অন্ধকার।

সাইবার বুলিং হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিভিন্ন ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট-সহ যে কোনো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাউকে উৎপীড়ন করা, ভয় দেখানো, লজ্জা দেওয়া বা উদ্বুদ্ধ করা। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কন্যাশিশু ও নারীদের প্রতি বারংবার সংঘটিত হয়ে থাকে। সাইবার বুলিংয়ের ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৫৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ নারী, যার অধিকাংশই স্কুল ও কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থী।

পর্নোগ্রাফি বা সাইবার বুলিংয়ের মতো কলুষতার শিকার শিশুরা শুধু শিক্ষা কিংবা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অধিকার হারায় তা-ই নয়, একইসঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বাঁধা পড়ে পুষ্টিহীনতার চক্রে। অনেক সময় শিশুকে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখায়, কখনো কখনো প্রেমের ফাঁদে ফেলে, পণ্য কেনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো স্থানে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। কন্যাশিশুরা বুঝতে পারে না। সহজ-সরল বিশ্বাসে তারা এসকল পথে পা বাড়ায়। এরপরই শুরু হয় তাদের জীবনে অন্য জগতের ছোঁয়া। এই সকল কন্যাশিশুদেরকে জোরপূর্বক যৌনকর্মে বাধ্য করার লক্ষ্যে শরীর বর্ধক ওষুধ খাওয়ানো হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তে কৃত্রিম নিয়মে বা ওষুধের মধ্য দিয়ে তাদের শরীর বৃদ্ধি করানোর ফলে শিশুটিকে ধীরে ধীরে গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার দিকে ধাবিত করা হয় এবং কৈশোর থেকে নারীত্বে পা দেওয়ার আগেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অপমৃত্যু ঘটে। পাশাপাশি পর্নোগ্রাফির আওতায় ব্যবহৃত শিশুদেরকে মাদক ও অস্ত্র পাচার কাজেও বাধ্য করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় চলতে চলতে একটা সময় শিশুটিও মাদকদ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত শিশুরা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় না, এর উপজাত হিসেবে জড়িয়ে পড়ে বিভিন্নমুখী অপরাধের সঙ্গেও।

সাইবার বুলিংয়ের শিকার শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে গুটিয়ে ফেলে। অল্প বয়সেই তারা বিয়েতে সম্মতি প্রদান করে। বাবা-মা-ও এসকল ভয়ে ভীত হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে বাল্যবিয়ে দিয়ে দেয়। তারা তাদের আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্নগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে পরনির্ভরশীলতার জালে জড়িয়ে পড়ে। স্বপ্নের পাখাগুলো একটি আতঙ্কের জালে আটকে পড়ে।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ) তথ্যমতে, সাইবার বুলিংয়ের হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। তাদের তথ্য মোতাবেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের হার ছিল ২০২০ সালে ১৬.৩১ শতাংশ, ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.৬৭ শতাংশ, যা আগের বছরের চেয়ে ২.৩৬ শতাংশ বেশি। একইভাবে যৌন হয়রানিমূলক একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি/ভিডিও করে ব্যবহার করে হয়রানি এবং ফটোশপে ভুক্তভোগীর ছবি বিকৃত করে হয়রানির ঘটনাও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। সিসিএ-এর তথ্য মোতাবেক, ২০২০ সালে এর হার ছিল ৭ দশমিক ৬৯, কিন্তু ২০২১ সালে এটি দাঁড়ায় ৯.৩৪ শতাংশ। তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে, অপরাধের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী।

পর্নোগ্রাফি যে একটি মানবতার চরম লঙ্ঘন এটি তুলে ধরতে আমি তিনটি ঘটনা (কেস স্টাডি) উল্লেখ করছি। তবে ঘটনার মূল চরিত্রে কন্যাশিশুদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতার কারণে।

কেস স্টাডি-১

প্রথম ঘটনাটি রাজধানী ঢাকার আদাবরে বাস করা ১৫ বছর বয়সী সুজানার। তার বান্ধবীর বড় ভাই ফয়সালের সঙ্গে তার প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা এক সময় শারীরিক সম্পর্কে গড়ায়। সুজানার সরলতা, ভালোবাসা ও বিশ্বাসকে পুঁজি করে ফয়সাল তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় এবং পুরো বিষয়টির ভিডিও ধারণ করে সুজানার অজান্তেই। এরপর শুরু হয় ফয়সালের 'ব্ল্যাকমেইলিং' খেলা। ৫০ হাজার টাকা না দিলে ভিডিওটি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয় ফয়সাল। কিশোরীর চোখে শর্ষে ফুল। সে দিশেহারা, সমাধান কী? আত্মীয়-স্বজন থেকে টাকা ধার নেওয়া থেকে শুরু করে মায়ের আংটি পর্যন্ত চুরি করে ৪০ হাজার টাকা দিলেও ফয়সাল তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে সুজানাকে চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে পাওনাদাররা। ফলাফলস্বরূপ আস্তে আস্তে সে মানসিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করে এবং একটা সময় গিয়ে যখন সবকিছু স্পষ্ট হয়, ততদিনে সুজানা মানসিক রোগী। এই যে মোবাইল ফোনে অনিচ্ছাকৃতভাবে ধারণ করা সুজানার ওই ভিডিওটি, তার শিক্ষা, তার স্বাস্থ্য সর্বোপরি তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে অবনতি ঘটিয়েছে তা চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন। কিন্তু এর দায় নেবে কে?

কেস স্টাডি-২

দ্বিতীয় ঘটনাটি মতিঝিলের সুমী আক্তারের। অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ার কারণে ১৩ বছর বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। বিয়ের পরপরই কন্যাশিশুর জন্ম, তারপর স্বামীর মৃত্যু–দু'বছরের মধ্যেই সব তছনছ। সুমীর ব্যাংকার বান্ধবী নীলার সূত্রে ওই ব্যাংকেরই উপ-পরিচালকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নীলাই পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম দেখাতেই ৪২ বছর বয়সী ওই উপ-পরিচালক অনেক আশার কথা শোনায় এবং একটি পর্যায়ে সুমীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীকে অসুস্থ বলে সুমীর আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে উপ-পরিচালক তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তার মা ও স্ত্রীর সঙ্গে সহকর্মীর বোন এবং চাকরির প্রয়োজন ইত্যাদি বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। এরপর কোনো বিয়ে নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) না করে এক মাওলানার মাধ্যমে সনাতনী প্রথায় তাদের বিয়ে হয়। পিতৃহীন ও অর্থনৈতিক টানাপোড়নের বেড়াজাল থেকে, মায়ের পরিবারের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেতে একটি আশ্রয়ের খোঁজে সে এধরনের বিয়েতে রাজি হয়। কিন্তু সুমীর জীবনে কোনো পরিবর্তনই আসেনি, শুধু ভোগের পণ্য হয়ে উঠেছিল সে। উপ-পরিচালক তিনমাস পরই বদলি নিয়ে চলে যায় সিলেটে। সেখানে গিয়ে একইভাবে ঐ বাড়ির কেয়ারটেকারের মেয়ের সঙ্গেও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আস্তে আস্তে সুমীর সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। যোগাযোগ করতে চাইলে সে জুজুর ভয় দেখায় এবং জানায়– তাদের শারীরিক সম্পর্কের সকল ধরনের ছবি সে ভিডিওচিত্র আকারে ধারণ করে রেখেছে, বাড়াবাড়ি করলে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবে। এতে সুমী ও তার সন্তানের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। এখন কে এই উপ-পরিচালকের বিরুদ্ধে লড়বে? কারণ সমাজের পচে যাওয়া শিক্ষিত নামধারী কিছু মানুষ সহজ সরল কন্যাশিশুদেরকে খারাপভাবে ব্যবহার করছে, যা প্রমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বিষহ। যেমন, এ ঘটনায় বিয়ে নিবন্ধনের (রেজিস্ট্রেশন) কোনো কাগজ না থাকায় তার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ারও সুযোগ ছিল না।

কেস স্টাডি-৩

তৃতীয় ঘটনাটি মেঘলার। সে অল্প বয়সে বাবাকে হারায়। মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে আর এগোতে পারেনি মেঘলা। একদিকে আর্থিক দৈন্যতা, অন্যদিকে সাংসারিক দায়িত্ব। ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরী–যার হেসে খেলে শৈশব কাটানোর কথা ছিল। এর পরিবর্তে মাসিক সাত হাজার টাকা বেতনে অফিস সহকারীর চাকরি মেলে বেসরকারি একটি সংস্থায়। সেখানেই সহকর্মী মেজবার সঙ্গে তার সখ্যতা থেকে প্রেম, তারপর শারীরিক সম্পর্ক এবং যথারীতি ভিডিও চিত্র ধারণ। একটা পর্যায়ে মেজবা মেঘলার ছোট বোনের দিকে হাত বাড়ায়। মেঘলা ঘটনাটি জানতে পারে এবং এর প্রতিবাদ করে। মেজবা এবার বিভৎস খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। সে মেঘলার কিছু বিকৃত ছবি এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি ভয় দেখায় এক লাখ টাকা না

দিলে এটি সর্বমহলে ছড়িয়ে দেবে। মেঘলা লজ্জা আর দ্বিধায় চাকরি থেকে অব্যাহতি নেয়। নিজের মান-সম্মান ও পারিবারিক ভয় ইত্যাদি মিলিয়ে এবার সে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। মেঘলা আমার (বর্তমান নিবন্ধের লেখক) কাছে ছুটে এসেছিল। আমি থানার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলেছিলেন জিডি করতে। কিন্তু সমস্যা হলো– প্রথমত, যে ছবিগুলো বেনামে ছাপিয়ে এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা বন্ধ করা যাবে কীভাবে? দ্বিতীয়ত, ওরা কীভাবে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে? তৃতীয়ত, মেজবার চাচা একজন রাজনীতিবিদ। তাঁর সাহায্যও চেয়েছিলাম। উল্টো অঙ্গুলি নির্দেশ প্রদান করে বলা হয়েছে– বাঁচতে চাইলে মেঘলাদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে, নইলে উল্টো কেস দেওয়া হবে। থানা থেকে জানানো হয়, এসব বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করতে, তা না হলে অনেক দিন পর্যন্ত এর মূল্য দিতে হবে মেয়ের পরিবারকেই।

উপরোল্লেখিত প্রত্যেকটি কেস নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এর নেপথ্যের কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। তা হলো: এরা সকলেই কিশোরী। তাদের স্বপ্নগুলো ছিল একটি স্বপ্নীল ভবিষ্যৎকে ঘিরে। আরেকটি বিষয় ছিল চরম দরিদ্রতা ও স্বল্প শিক্ষা, অন্যকে সহজে বিশ্বাস করা এবং বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা। সর্বোপরি তিনজনই জীবনসঙ্গী কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন। তাদের স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্রকে বিকৃত করে পুরুষ সঙ্গী কর্তৃক প্রচার করার ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি করা এবং ইন্টারনেট-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করে অর্থ উপার্জনের একটি ক্ষেত্র তৈরি করার প্রচেষ্টা ছিল তাদের। আর এই তিনজন মানুষ নামক নরপশুর মধ্যেই এটি সীমিত ছিল না,, এর শেকড় ও বিস্তৃতিও ছিল অনেক গভীরে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনস্তত্ত্বেই রয়েছে নারীকে নির্যাতনের নির্যাস।

বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর 'Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC)'-এ স্বাক্ষর করে। এরই ধারাবাহিকতায় নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২' (Pornography Control Act-2012) প্রণয়ন করে। এ আইনের ৮(৬) ধারায় শিশু পর্নোগ্রাফির শাস্তিস্বরূপ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের কথা বলা আছে।

আমাদের দেশে 'শিশু আইন, ২০১৩' ও 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০১০' রয়েছে। সকল আইনেই শিশুদের প্রতি নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হলে আইনের বিধান মতে শাস্তির বিষয়টিও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা আছে।

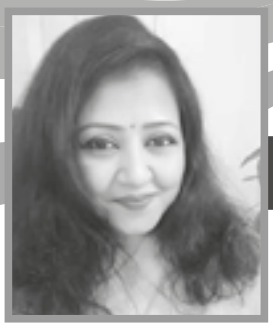
'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' এর ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি ও ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যা আক্রমণাত্মক বা ভীতি

প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন। বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা উদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করতে সহায়তা করেন, তাহলে ওই ব্যক্তির এ ধরনের কাজ হবে একটি অপরাধ। যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।'

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এতসব আইন থাকার পরও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বদিচ্ছা ও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে পর্নোগ্রাফিও সাইবার বুলিং-সহ কন্যাশিশু ও নারীদের প্রতি নির্যাতন রোধ করা যাচ্ছে না। তাছাড়া এ আইন সম্পর্কে অনেকেই জানে না। আবার জানলেও সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে অনেকে আইনের আশ্রয় নেয় না। তথ্য মোতাবেক সাইবার বুলিংয়ের শিকার বা ভুক্তভোগীদের ৭৩ দশমিক ৪ শতাংশই আইনের আশ্রয় নেয় না। এছাড়া আইনের আশ্রয় গ্রহণকারী ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ আইনি সেবার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

শিশু পর্নোগ্রাফি ও সাইবার রোধে শিশুদেরকে আরও বেশিও সচেতন করতে হবে। যেমন, নিরাপদ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা। অনলাইনে অপরিচিত কারো সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িয়ে না পড়া। নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, ভিডিও চিত্র শেয়ার করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া। অনলাইনে কেউ উত্ত্যক্ত করলে, সন্দেহজনক আচরণ করলে তা মা/বাবা বা অভিভাবকদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য শিশুকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইনি কর্তৃপক্ষকে জানানো। অন্যদিকে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য আমাদের নজর দিতে হবে। সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধগুলোও ফিরিয়ে আনতে হবে। নাগরিকদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে, তৎপর হতে হবে।

শুধু আইন করে এ অপরাধ দমন করা যায়নি, যাবেও না। তাৎক্ষণিকভাবে আইনি সহায়তার জন্যসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। যেমন, ১. পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন (মোবাইল: 01320-000888; ই-মেইল: cyebrsupport.women@police.govbd); ২. সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ডিএমপি (মোবাইল নাম্বার: 01769- 691522; ই-মেইল: cyberhelp@dmp.gov.bd); ৩. সাইবার পুলিশ সেন্টার, সিআইডি (মোবাইল: 01320-010148,01730-336431; ই-মেইল: cyber@police.gov.bd; ৪. জাতীয় জরুরি সেবা: 999।



নুসরাত জাহান শাওন*

কন্যাশিশুর সুরক্ষা ও অধিকার: প্রতিশ্রুতি ও পরিস্থিতির ব্যবধান

পৃথিবীজুড়ে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে ২০১২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, পরিপুষ্টি, আইনি সহায়তা ও ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে এ দিবসের সূচনা হয়। জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মতো বাংলাদেশও প্রতি বছর ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসটি পালন করে থাকে। এর পাশাপাশি ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়।

আমরা লক্ষ করলে দেখবো যে, ২০১১ সালে বাংলাদেশে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' প্রণীত হয়, যেখানে বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দলিল ও ঘোষণায় প্রদত্ত নারী উন্নয়ন বিষয়ক অঙ্গীকারসমূহের প্রতিফলন ঘটেছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর অধ্যায় ১৮ তে কন্যাশিশুর উন্নয়ন নিয়ে সুনির্দিষ্ট আটটি দিক নির্দেশনা রয়েছে:

১৮.১ বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ;

১৮.২ কন্যাশিশুর চাহিদা যেমন: খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা;

১৮.৩ কন্যাশিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা;

১৮.৪ কন্যাশিশুর প্রতি সকল শিশুর বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা;

১৮.৫ কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

*** ডেপুটি ডিরেক্টর, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন, এস ও এস চিলড্রেন্স ভিলেজেস বাংলাদেশ**

১৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, রাস্তাঘাটে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

১৮.৭ কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা;

১৮.৮ প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

এই নীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৩ সালে একটি সমন্বিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয় । এই কর্মপরিকল্পনায় কন্যাশিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । এসকল কর্মসূচির মধ্যে:

কন্যাশিশুর সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং জোরালো বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ; বিচারক, কাজি, ইমাম, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনকে কন্যাশিশু সম্পর্কিত আইন-কানুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি; বাল্যবিবাহপ্রবণ এলাকা শনাক্তকরণের মাধ্যমে পরিবার, কমিউনিটি ও স্কুলভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ কন্যাশিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও খেলাধুলার গুরুত্ব বিষয়ে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি, কন্যাশিশুদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ, সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশুদের সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, কন্যাশিশুদের জন্য খেলাধুলার জন্য পৃথক মাঠ নির্বাচন এবং আলাদাভাবে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, গণমাধ্যমে কন্যাশিশুদের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার গাইডলাইন তৈরি ও ব্যবহার, পরিবারের পুরুষ সদস্যসহ সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন এবং এর মাধ্যমে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, কন্যাশিশুর জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জাতীয় পর্যায় থেকে কমিউনিটি পর্যায় পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব পালন জেরদারকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

এসকল কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপনের প্রত্যেকটি লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব । কিন্তু বাস্তবে তাকালে আমরা কী দেখি? সরকারের নানান ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও শিশুরা এবং বিশেষ করে কন্যাশিশুরা তাদের অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের সম্ভাব্যতা । আর সেই কন্যাশিশুরা যদি সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশু হয়, তাহলে এই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক ।

২০১২ সালের প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।' কিন্তু তার একদশক পরও জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক সংস্থা ইউএনএফপিএ-এর সবশেষ প্রতিবেদন বলছে, বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে এখন এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। যদিও কোভিড-১৯ এর কারণে পরিস্থিতি অনেক জটিল হয়েছে, সমস্যার ভীড়ে জড়ো হয়েছে আরও নতুন নতুন সমস্যা, প্রাধান্য হারাতে বাধ্য হয়েছে অনেক সমস্যা। কিন্তু তারপরেও প্রতিবেদনের এই তথ্য আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রতিশ্রুতি ও পরিস্থিতির বাস্তব ব্যবধান।

আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের একজন সুশিক্ষিত নারী ও আদর্শ মা। এই শিশুই এক সময় আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলোকিত করবে। শুধু আইন করলে বা সনদ গৃহীত হলেই শিশুরা সুরক্ষা পাবে না, বরং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই নিশ্চিত করতে হবে কন্যাশিশুর বাধাহীন আনন্দময় সুরক্ষিত শৈশব।

'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার', 'আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার', 'আমরা কন্যাশিশু প্রযুক্তিতে হবো সমৃদ্ধ', 'শিক্ষা-পুষ্টি নিশ্চিত করি, শিশু বিয়ে বন্ধ করি', 'সময়ের অঙ্গীকার, কন্যাশিশুর অধিকার' ইত্যাদি প্রতিপাদ্য বছরের একটি দিন উদ্‌যাপনের মাধ্যমেই যেন হারিয়ে না যায়। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে যখন তা আমরা ধারণ করতে পারবো পালন করবো, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারবো, তখনই সুরক্ষিত হবে প্রতিটি কন্যাশিশুর সুরক্ষা ও অধিকার।



ফওজিয়া মোসলেম*

কন্যাশিশুর ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রয়োজন লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথিতযশা আইনবিদ উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন (১৪২৪-৮০)। তিনি ছিলেন একাধারে আইনবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশ আইন তাঁর রচিত Commentaries on the laws of England ভিত্তি করে প্রণীত। সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার তিনটি দায়িত্ব উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন চিহ্নিত করেছেন। দায়িত্বগুলো হলো সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, সুরক্ষা ও শিক্ষা। শিশু অধিকার জেনেভা ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয় ১৯২৪ সালে লিগ অব নেশনস কর্তৃক। সেখানে বলা হয়, 'শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের অধিকার, ক্ষুধার্ত শিশুকে খাওয়ানোর অধিকার, অসুস্থ শিশুর স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার, পিছিয়ে পড়া শিশুর অধিকার ফিরে পাওয়া অধিকার, মাতৃ-পিতৃহীন শিশুর আশ্রয়ের অধিকার এবং শোষণ থেকে সুরক্ষার অধিকার'– এ সকল কিছুই শিশুর অধিকার।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৫৯ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের আলোকে প্রণয়ন করে জাতিসংঘের শিশু অধিকার ঘোষণাপত্র। যার মধ্যে রয়েছে দশটি নীতিমালা। যেগুলোর লক্ষ্য হলো শিশুদের অধিকারের সর্বজনীন অধিকার-সহ বিশেষ সুরক্ষার অধিকার এবং বৈষম্য থেকে সুরক্ষার অধিকার।

বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ১৭ শিশুশিক্ষার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের আইনি কাঠামোতে শিশু অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে কিছু সংরক্ষণ-সহ বাংলাদেশ অনুসংরক্ষণ প্রদান করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে শিশু অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ।

দেশে দেশে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের চলমান অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শিশু অধিকারের সর্বজনীনতার পাশাপাশি রয়েছে বৈষম্য ও ভিন্নতা। বিশেষ করে বিকাশের সুযোগ-সহ সকল অধিকারের ক্ষেত্রে শিশু বয়স থেকেই কন্যাশিশু বৈষম্যের শিকার। বিশ্ব জুড়ে এই বাস্তবতা নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ২০১২ সালে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। শিশুকন্যার শিক্ষার অধিকার, পুষ্টি, আইনি সহায়তার

*** সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ**

ন্যায্য অধিকার, চিকিৎসার সুবিধা, বৈষম্য ক্ষেত্রে সুরক্ষা নারীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ তথা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হলো কন্যাশিশু দিবসের লক্ষ্য। ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই অক্টোবর জাতীয় কন্যাশিশু সপ্তাহ ঘোষিত হয়।

জাতিসংঘভুক্ত দেশসমূহ এই সপ্তাহের যে কোনো একটি দিন 'কন্যাশিশু দিবস' হিসেবে পালন করার নীতি গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে কন্যাশিশুর সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩০শে সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা করে। এর পর থেকে প্রতি বৎসর সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য অনুযায়ী জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের উপাত্ত থেকে জানা যায় বাংলাদেশে স্কুল বয়সী শিশুর (৬-১৭ বৎসর) সংখ্যা ৩ কোটি ৭৬ লাখ। বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় দশভাগ কন্যাশিশু। বহুবিধ পরিকল্পনা থাকলেও কন্যাশিশুরা লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে অবহেলিত ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মনমানসে যে নারী বিদ্বেষী মনোভাব রয়েছে তা কন্যাশিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শিশুর মৌলিক অধিকারগুলো বিবেচনা করলে শিশুকন্যার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যগুলো চিহ্নিত হবে। শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রগুলো হলো:

বেঁচে থাকার অধিকার

যে কোনো ব্যক্তির জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজন খাদ্য, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করলে পুষ্টিকর খাদ্য। শেরে বাংলা নগরস্থ কৃষি বিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। তবে এর মধ্যে ছেলেশিশু ও কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। গুরুতর অপুষ্টির ক্ষেত্রে ছেলে ও কন্যাশিশুর অনুপাত ৫৩:৫১%; মাঝারী ধরনের ক্ষেত্রে ১৭:১৮.১%। দারিদ্র্য-সহ বহুবিধ অন্যতম বিষয়টি হলো কন্যাশিশুর প্রতি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি কন্যাশিশুর জীবনের শুরুতেই খাদ্যাভাব তৈরি করে, অথচ কন্যাশিশুর পরবর্তী জীবনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য্য।

এছাড়া সংবাদ মাধ্যমে প্রায়ই দেখা যায় গর্ভকালীন সময়ে কন্যাশিশুর ভ্রুণ চিহ্নিত হলে সেক্ষেত্রেও রয়েছে ঐচ্ছিক গর্ভপাতের প্রবণতা। সুতরাং ভ্রুণ অবস্থা থেকে শুরু করে জীবনব্যাপী কন্যাশিশুকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে হয়।

বিকাশের অধিকার

শিশু বিকাশের মাধ্যমে হলো শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন। বর্তমান সময়ে আমাদের ভৌত উন্নয়নের যে কর্মকা- চলছে সেখানে শিশুদের খেলাধুলার স্থান বা পার্ক শহরাঞ্চলে নেই বললেই চলে। সামগ্রিকভাবেই শিশুদের বিকাশের লক্ষ্য খেলাধুলা বা

বিনোদনের এই সুযোগ সঙ্কুচিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি মোট শিক্ষার্থীর ৫১%; এর মধ্যে ১৪.১৫% প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ে (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়েও কন্যাশিশুর শিক্ষার অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এছাড়াও বাল্যবিবাহ কন্যাশিশুর শিক্ষার সুযোগ ও তার শৈশবও কেড়ে নিচ্ছে। বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ৫১%, বৈশ্বিক সূত্রে বাংলাদেশ বাল্যবিবাহে এই অঞ্চলে শীর্ষে অবস্থান করছে। বাল্যবিবাহ শুধু শিক্ষা নয়, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর জীবনে অভিশপ্ত করে তুলছে। শিক্ষার সুযোগ অনেক দূরের প্রশ্ন, বাল্যবিবাহের ফলে কন্যাশিশুর জীবন একটি বিষচক্রে আবর্তিত হয়। তবে আশার কথা যে, বর্তমানে প্রায় সকল কন্যাশিক্ষা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তারা এই বিষচক্র ভেদ করার আশায় সাহসী ভূমিকা রাখছে।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের কোনোভাবেই উৎসাহিত করা হয় না। উপরন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্রীড়া নিপুণ কন্যাদের ওপর সহিংস আক্রমণ চালানো হচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার

সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার কন্যাশিশুর জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সুশাসনের অভাব, দারিদ্র্য, আইন সহায়তা প্রাপ্তির অপ্রতুল সুযোগ কন্যাশিশুর জীবনকে প্রতিনিয়ত অরক্ষিত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে সংরক্ষিত (১৩টি দৈনিক পত্রিকা) তথ্য থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে ১ হাজার ৬২৯ জন কন্যা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণ ৬৭২ জন, দলবদ্ধ দর্ষণ ১২১ জন এবং ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন ২৮ জন। ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে সাতজন কন্যা। ধর্ষণের চেষ্টায় পীড়িত হয়েছে ৯৪ জন। এছাড়াও যৌন নিপীড়নের শিকার ১২২ জন, উত্যক্তকরণ ১০৪ জন, উত্যক্তকরণের জন্য আত্মহত্যা করেছে ছয়জন। কন্যাশিশুর প্রতি এই সহিংসতা তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার হরণ করছে। রাষ্ট্র ও সমাজকে এই দায় অনুধাবন করে কন্যাশিশুর অধিকার সংরক্ষণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

অংশগ্রহণের অধিকার

শিশুকে আমরা বিবেচনা করি অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে, যার নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই। পিতামাতা, অভিভাবক, রাষ্ট্র তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ধারণাটি মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে। কারণ জন্মের পর থেকে বয়স ভিত্তিতে চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাই পিতামাতা, অভিভাবক ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শিশুর চাহিদা প্রকাশের নিজস্ব ধরন আছে, যেটি প্রকাশের জন্য শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যেমন, পুষ্টিদায়ক খাদ্য ও শিক্ষার অধিকার দেওয়া এবং পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের

মতামত শোনা। এটি তাদের বিকাশের অন্যতম অংশ মস্তিষ্ক বা সাধারণভাবে তার চিন্তাশক্তি অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবে। শিশুদের সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তি ও পরিবর্তনকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সাম্প্রতিককালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কন্যাশিশুদের ভূমিকা, ক্রীড়াজগতে মেয়েরা যে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে অগ্রগামী হচ্ছে এগুলো শিশুর অংশগ্রহণকে অনিবার্য প্রমাণ করছে। খেলার মাঠ নিয়ে শিশুদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, দুর্ঘটনায় সতীর্থ বন্ধুর প্রয়াণকে কেন্দ্র করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় মতামত প্রদান এগুলো শিশুদের অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। শিশুর অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত করা, সুযোগ সৃষ্টি করা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা দেখছি লিঙ্গ বৈষম্য অতিক্রম করে সমাজকে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কন্যাশিশুরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সেটি দূরীভূত করতে পারলে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসের কাজটি আরও ত্বরান্বিত হবে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়গুলোকেও এই সময় মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত প্রভাব এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিম্নে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

✦ লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী কন্যাশিশু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ রাখা;

✦ মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় পৃথক করে মহিলা এবং শিশু বিষয়ক দুটি কার্যকর মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা;

✦ শিশুর অধিকারের ক্ষেত্রগুলোর বাস্তব অবস্থা চিহ্নিত করার জন্য গবেষণা করা এবং তথ্য উপাত্তকে কন্যাশিশু ও ছেলেশিশুর জন্য পৃথক করা;

✦ বাল্যবিবাহ নির্মূলে শিশু অধিকার কনভেনশনের আলোকে যথাযথ সমন্বিত কর্মসূচি নেওয়া;

✦ মানবাধিকার রক্ষায় কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নির্মূলে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

✦ কন্যা ও ছেলে উভয়ের অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমের সমমূল্যায়ন করা।

আগামীর বাংলাদেশে শিশুর নিরাপদ বিকশিত মানবিক জীবন প্রতিষ্ঠা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে পালন করার প্রস্তুতি নিতে হবে। লিঙ্গ সমতা ও শিশু অধিকারে অভিচ্ছেদ্য অংশ। কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন বিকাশে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।



ফরিদা আকতার*

যৌন নির্যাতন রোধে করণীয়

মুনিরা কাউন্সিলিং এর সেশন নিতে এসেছে ওর মায়ের সঙ্গে। প্রথমে ও জড়সড় হয়ে ভয়ে বসেছিল মনোবিজ্ঞানী তামান্না হকের সামনে। মুনিরার সঙ্গে ওর মাও আছেন। তামান্না হক প্রথমে নিজের একটা ছোট্ট পরিচয় দিলেন। কেমন হাসিহাসি মুখে নরম গলায় কথা বলছিলেন। মুনিরার ভয় আর জড়তা আস্তে আস্তে কাটতে লাগল। তামান্না হক বললেন, তিনি মুনিয়ার সঙ্গে একা কথা বলতে চান। মাকে বসানো হলো অন্য ঘরে। ধীরে ধীরে মুনিরা বলতে লাগল তার মনের কথা। মনোবিজ্ঞানী তামান্না হক এমন সব প্রশ্ন করলেন, যার জন্য মুনিরার নিজেকে মেলে ধরতে খুব সহজ হচ্ছিল। মুনিরার বয়স আঠারো। ও এ-বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এখনও ফলাফল বের হয়নি। মুনিরার কথা থেকে যেসব সমস্যার কথা বের হয়ে এলো, তা যদি ছোট করে লেখা যায়, তাহলে এমন হবে–

১. মুনিরা ছেলেদের পছন্দ করে না। ওর কোনো ছেলে বন্ধু নেই। মেয়ে বন্ধুদের মাঝে কোনো ছেলে চলে এলে সে আস্তে করে সেখান থেকে সরে পড়ে;

২. প্রায়ই মুনিরার মন খারাপ থাকে। মন খারাপের কোনো কারণ ও খুঁজে পায় না;

৩. খাবারে তার যে অরুচি তা নয়, সে খেতে পারে ঠিকমতো। কিন্তু খাবার পরপরই তার বমিবমি ভাব হয়। সব সময় যে বমি হয় তা নয়, তবে বমিবমি ভাবটা থাকে। এই বমি হওয়ার বা বমি ভাবের কোনো কারণ ডাক্তাররা খুঁজেপাননি;

৪. মুনিরার নিজের জীবনের ব্যাপারে খুব নেতিবাচক ধারণা। সে জীবনে ভালো কিছু করবে বলে তার মনে হয় না। মনে হয় আমার দ্বারা ভালো কিছুই হবে না। তার মনে হয় ছেলেরা ওপর দিয়ে যতই বন্ধুত্বের কথা বলুক না কেন,আসলে তারা যৌন জীবনে আগ্রহী। যৌন কাজই তাদের আসল লক্ষ্য;

৫. মুনিরা কোনো ছেলেকেই বিশ্বাস করতে পারে না। তাই সে এ-বয়স থেকেই

* মনোবিজ্ঞানী, কাউন্সিলর, প্রশিক্ষক ও প্রধান নির্বাহী, ইনার ফোর্স

ভাবছে, সে কোনোদিন বিয়ে করবে না;

৬. মাঝে মাঝেই মুনিরা ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে থাকে। কান্না আর বন্ধ করতে পারে না। এ তো গেল মুনিরার কিছু লক্ষণের কথা।

মুনিরার সঙ্গে কথা বলে আরও জানা গেল, মুনিরাদের বাড়ির পাশের বাড়ি ওর বড় চাচার। সব আত্মীয়-স্বজনই মোটামুটি এক জায়গায় থাকে। মুনিরা থাকে খুলনার একটি ছোট্ট গ্রামে। আরও জানা গেল, মুনিরার বয়স যখন ১২-১৩ বছর, তখন তার চাচাতো ভাই মাসুদ তাকে প্রায়ই যৌন নির্যাতন করত। গোপন অঙ্গে হাত দিত, জড়িয়ে ধরত, ঠোঁটে চুমু খেত, বুক চেপে ধরত। মুনিরা প্রথমে ব্যাপারটি কী তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন বুঝেছে তখন সে মাসুদকে বলে আপনি এখন থেকে এসব কিছু করবেন না। তাহলে আমি বাবা-মাকে সব বলে দিব। মাসুদ উল্টো বলে, তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে তুমি সিনেমা দেখে দেখে বেশি পাকা হয়ে গেছো, তাই সব বানিয়ে বানিয়ে বলছো। আর আমি বলব, তুমিই আমাকে খারাপ কাজ করার কথা বলেছ। এবার বুঝেছ, চুপ করে থাকাই তোমার জন্য ভালো। মুখ খুললেই বিপদ। এভাবে দিনের পর দিন সুযোগ নিতে থাকে মাসুদ।

দু-বছরের মাথায় যখন মাসুদ মুনিরাকে ধর্ষণ করা শুরু করে, তখন আর সহ্য করতে পারে না মুনিরা। বাবা-মাকে সাহস করে আর লজ্জা ভেঙে সব জানিয়ে দেয় মুনিরা। বাবা-মা মাসুদকে ডেকে ঠিক কী বলেছিলেন তা জানে না মুনিরা। তবে সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে যায় এই অত্যাচার। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তাই আজ নানারকম সমস্যায় ভুগছে মুনিরা।

মনোবিজ্ঞানী তামান্না হকের কাছে প্রায় ১২টি সেশন নেয় মুনিরা। কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া তাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। সুস্থ মানসিকতা নিয়ে মুনিরা ফিরে যায় গ্রামে। কিন্তু সব সময় যে ব্যাপারটি তাকে তাড়া করে, তা হলো– আমি কি একাই এ পরিস্থিতির শিকার হয়েছি, না-কি অন্য কিশোরীরাও এ অবস্থায় পড়ে। যদি এটা অন্যদেরও সমস্যা হয়, তবে আমি তাদেরও সাহায্য করতে পারি। মুনিরার দু'জন কাছের বন্ধু নীলা আর সোমা। মুনিরা নীলা আর সোমার কাছে তার চিন্তার কথা খুলে বলে। সব শুনে সোমা আর নীলা বলে, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছ। যৌন নির্যাতন নিয়ে চলো আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট নেই। প্রথমে আমাদের যা করতে হবে, তা হলো– কিশোরী সংঘের মাধ্যমে একটি উঠান বৈঠক করা। সমাজসেবার জরিনা আপাকে সঙ্গে নিলে খুবই ভালো হবে।

আজ তাদের ক্লাবের উঠানে উঠান বৈঠক। জরিনা আপাও আছেন সঙ্গে। জরিনা আপা আলোচনা পরিচালনা করছেন। এক এক করে সবাই যৌন নির্যাতনের ব্যাপারে এমন সব কথা বলতে লাগল, যা তারা আগে কখনও কাউকে বলেনি।

মনে হচ্ছে বাঁধন ভেঙে গেছে। প্রত্যেকে তাদের কষ্টের কথা খুলে বলা শুরু করল। প্রথমে শুরু করে জরি। জরি যখন পাঁচ-ছয় বছরের ছিল তখন তাদের বাড়িতে যে ঝিয়ের কাজ করত, সেই ঝিয়ের ছেলে তাকে নানাভাবে যৌন নির্যাতন করত। সেও প্রথমে বাবা-মাকে বলেনি। তারপর একদিন লজ্জা ভেঙে বলেই ফেলে জরি। বাবা-মা সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঝিকে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেন। ছেলেটিকে অনেক বকাবকি করেন। বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে না করে দেন। বাবা থানায় গিয়ে একটা জিডি করেন।

আফরোজা বলে, আমার কাহিনি আবার অন্যরকম। আমি এমন কারও কাছ থেকে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছি, যাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। তিনি আমাকে বাসায় এসে পড়াতেন। প্রথমদিকে খুব ভদ্র আচরণ করতেন। তাই মাও উনাকে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন বলে বাইরের ঘরে না বসিয়ে পড়ার ঘরেই উনাকে পড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। একদিন হঠাৎ উনি আমাকে টেনে নিয়ে কোলে বসালেন। আমার গোপন অঙ্গে হাত দিলেন। চেপে ধরলেন। আমাকে। আমার শরীরটা ঘিনঘিন করে উঠল। আমার মনে আছে, শ্রদ্ধা ভেঙে যাওয়ার কষ্টে আর ঘৃণায় সেই রাতে আমি প্রচুর কেঁদেছিলাম। শ্রদ্ধা করি এমন একজন মানুষের ব্যাপারে বলতে/অভিযোগ করতে পারছিলাম না। তবে না বলতে পারার আরেকটা কারণ হলো লজ্জাবোধ। আমার ঐ স্যার প্রায় প্রতিদিনই একই কাজ করতে লাগলেন। এক সময় আমি আর নিতে পারলাম না। সব খুলে বললাম বাবা-মাকে। বাবা-মা তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার কান্না দেখে তারা নরম হলেন। বুঝতে পারলেন আমি সত্যি কথা বলছি। বাবা স্যারকে খুব বকা দিলেন। আর ঐদিনই পড়ানোর কাজ থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। যদিও ঘটনাটা এখন আর ঘটে না। কিন্তু এই স্মৃতি আমাকে এখনও তাড়া করে ফেরে। মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি নির্যাতনের দৃশ্য। কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারি না। এমনকি নিজের আপন ভাইকেও নয়। পৃথিবীটা আমার কাছে অবিশ্বাসের হয়ে গেছে। সব শুনে জরিনা আপা বললেন, আজ তোমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। সবাই মন দিয়ে শোনো। প্রথমে আমাদের যে বিষয়গুলো জানতে ও বুঝতে হবে, তা হলো:

✦ যৌন নির্যাতনের কথা বলা কোনো অশ্লীলতা নয়, লজ্জাজনক বিষয় নয়; বরং এটি আমাদের প্রকাশের অধিকার:

✦ আমরা যখন কখনও নির্যাতিত হব, সে যে ব্যক্তিই হোক না কেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাছের মানুষকে জানাতে হবে;

✦ কোনো নির্যাতনকারী সাধারণত চট্ করে নির্যাতন করে না। নানাভাবে আকার-ইঙ্গিতে নিজের ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে। তাই এই ইঙ্গিতগুলো বোঝার জন্য আমাদের মানসিকভাবে সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, কেউ যদি

আমাদের যৌন নির্যাতন করে, তাহলে আমি অপবিত্র হয়ে যাইনি, আমি অপরাধ করিনি; বরং নির্যাতনকারী অপরাধী। তাই আমরা নির্যাতনের শিকার হলে নিজেকে অপরাধী ভাববো না, মাথা নিচু করে থাকব না,আমি নষ্ট হয়ে গেছি– এমন চিন্তা করব না;

✦ লক্ষ রাখতে হবে– নির্যাতনের ঘটনা জনে জনে অর্থাৎ সবাইকে বলার প্রয়োজন নেই। বাবা-মা আর একান্ত কাছের মানুষ, যাকে বললে মন হালকা হবে– এমন কাউকে কথাগুলো বলতে হবে। নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য কিছু কৌশল আছে, সেটি হলো:

ক. বাড়ির কাউকে আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রাখা, যাকে আমি আমার নির্যাতনের কথা বলতে পারব। হতে পারে সে বাবা অথবা মা অথবা বড় বোন। এ ব্যক্তিকে আমরা বলব Body Guard বা সুরক্ষাকারী;

খ. কেউ নির্যাতন করার চেষ্টা করলে চিৎকার করে উঠতে হবে, আশপাশের সবাইকে জানান দিতে হবে– আমার ওপর নির্যাতন হচ্ছে;

গ. তৃতীয় কৌশলটি হলো– ঐ জায়গা থেকে দৌড়ে সরে যেতে হবে মানুষজনের মাঝে বা নিরাপদ জায়গায়;

ঘ. ঐদিনই যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি বডি গার্ডকে খুলে বলতে হবে।

✦ যদি যৌন নির্যাতনের জন্য বা অন্য কারণে মনোবিজ্ঞানী/কাউন্সিলিং এর কাছে নেওয়া হয়, তবে তাকে নির্যাতনের কথা খুলে বলতে হবে;

✦ নির্যাতনের শিকার হলে এমন মনে না করা যে আমার জীবন থেমে গেছে। বরং আগে যেসব কাজ করতে যেমন, লেখাপড়া, খেলাধুলা ও ধর্মীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে;

✦ আমাদের সবাইকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল জানতে হবে। আর তাহলে আমরা যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার আগেই তা ঠেকাতে পারব। এ কৌশলগুলো হলো–

কেউ যদি মনের জানালায় টোকা দেয়, তবে জানালা খোলা যাবে না। যেভাবে তোমরা বুঝবে যে কেউ তোমার মনের জানালায় টোকা দিচ্ছে–

১. কথায় কথায় কেউ অশ্লীল/নোংরা চুটকি বা কথা বললে;

২. শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে কথা বললে;

৩. তুমি খুবই যৌন আবেদনময়ী (সেক্সি) এমন কথা বললে;

৪. কথা বলার সময় শরীরের বেশি কাছাকাছি চলে এলে;

৫. বেশি বেশি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে, যেমন, তোমার কি কারও সঙ্গে প্রেম চলছে?

৬. তোষামোদি করলে, অর্থাৎ সত্য নয় এমন বিষয়ে প্রশংসা করলে।

এছাড়া তিনি আরও বললেন, ছেলেরা কোনো বাজে মন্তব্য করলে, চট করে রেগে না গিয়ে বরং শান্ত মাথায় উত্তর) দেবে। কারণ যে বাজে কথা বলছে সে সাধারণত রাগানোর জন্যই এমন কথা বলে। নোংরা ইঙ্গিত দিলে পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে বলবে, 'আমি আপনার এই ব্যবহার পছন্দ করছি না। আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন না।' আজকে আমি যা কিছু বললাম তা তোমরা জানলে। আশা করি, তোমরা সেগুলো বুঝেছ। এখন থেকে এগুলো মনে রাখবে আর মেনে চলবে। এছাড়া এ তথ্যগুলো দিয়ে অন্য কিশোরীদের সাহায্য করবে।



ফরিদা ইয়াসমিন*

যোগ্যতা ও মানসিক দৃঢ়তায় নারীর মুক্তি

একটি সুন্দর, শান্তিময়, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক পৃথিবী গড়ার কাজে পুরুষের সমান অবদান রাখার প্রত্যয় নিয়ে নারীরা এগিয়ে চলছে। একবিংশ শতাব্দীর মূল প্রতিপাদ্যই হলো নারী-পুরুষ সমান অধিকারের ভিত্তিতে হাতে হাত রেখে সামনে এগিয়ে যাবে। এগিয়ে নেবে দেশকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজও আমাদের প্রতিদিনই শুনতে হচ্ছে, দেশের কোথাও না কোথাও নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন, কোথাও না কোথাও নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, কোথাও না কোথাও যৌতুকের বলি হয়ে নারী আত্মঘাতী হচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য সুখকর নয়। নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখলে দেখা যায়, নারীরা প্রধানত পরিবারেই সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। যতোটা না শারীরিকভাবে নির্যাতিত, তারচেয়ে অনেক বেশি নির্যাতিত হয় মানসিকভাবে। নারী নির্যাতনের ঘটনার জন্য আমাদের গোড়ায় যেতে হবে। একজন ছেলে যেমন বড় হয়ে তার পরিবারে অবদান রাখতে পারবে, একজন নারীও তা পারবে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি না আসা পর্যন্ত নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো বাড়তেই থাকবে।

আমি মনে করি, নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ নারীদের অজ্ঞতা। যে নারী যত বেশি অজ্ঞ, সে তত বেশি নির্যাতিত। হোক সেটা অজপাড়া গাঁ, মফস্বল কিংবা শহুরে জীবন। নারী নির্যাতনের আরেক কারণ পরনির্ভরশীলতা। নারী যত পরনির্ভর হবে, সমাজে-পরিবারে তার অবস্থান তত তলানিতে থাকবে। তাই নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তিত্ববান হতে হবে। একইসঙ্গে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

তবে নারী নির্যাতন বন্ধে এবং নারীদের সম-অধিকার নিশ্চিতে পুরুষের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ দিতে হবে রাষ্ট্রকে।

সমাজে একটা ধারণা আছে, পুরুষরাই কেবল অর্থনীতিতে তাদের ভ্যালু যোগ

*** সাংবাদিক ও সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব**

করছেন, দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে তারা কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু নারীরা যে কর্মস্থল-সহ পরিবারের সব কাজ করছেন সেটাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। পুরুষদের মনে রাখতে হবে, আপনি কেবল বাইরে কাজ করছেন। এরপরই আপনি বিরতিতে যাচ্ছেন। অথচ একজন নারী ঘরের বাইরে যেমন কাজ করছেন, তেমনি ঘরেও করছেন। পাশাপাশি সন্তান লালন-পালন করছেন তারা। একইসঙ্গে তারা যেমন বর্তমান অর্থনীতিতে 'ভ্যালু অ্যাড' করছেন। অন্যদিকে সন্তানদের যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য যোগ্য-দক্ষ-কর্মক্ষম নাগরিক তৈরি করছেন।

তবে নারীদের সম-অধিকার নিশ্চিতে এবং সমাজে নিজেদেরকে পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তুলতে হলে নারীদেরও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নারীদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীর কেউ কাকে কোনো সিঁড়ি তৈরি করে দেয়নি। বিশেষ করে নারীদেরকে তো নয়-ই। তাই নারীদের নিজেদেরই সেই সিঁড়ি তৈরি করতে হবে। সেই সিঁড়ি তৈরি করতে হলে নারীদের সবার আগে যেটা করতে হবে, তা হলো যোগ্যতা অর্জন। যোগ্যতা, মেধা একজন নারীকে সমাজের সর্বোচ্চ পদে নিয়ে যেতে পারে। তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

তাই নারীদের সবার আগে দরকার যোগ্যতা ও মেধা অর্জন করা। এটা মনে রাখতে হবে যে, যোগ্যতা ছাড়া কোনো জায়গায় টেকা সম্ভব না। এরপর দরকার দৃঢ়চেতা হওয়া। কারণ জীবনে শত বাধা আসবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে পিছিয়ে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া। যে কোনো পরিস্থিতিতে পিছিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই নারীকে দৃঢ়চেতা হতে হবে। প্রচণ্ড মেধাবী হতে হবে তাকে। গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাকে আপ টু ডেট থাকতে হবে। পরিবারে নিজের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। এছাড়া নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নিজের চারপাশে একটি ব্যক্তিত্বের দেওয়াল তৈরি করতে হবে। যাতে ঠুনকো ধাক্কায় সেই ব্যক্তিত্ব ভেঙে না পড়ে। নারীকে প্রমাণ করতে হবে, নারী পারে, নারী পেরেছে এবং আগামীতেও নারী পারবে।



ফরিদা ইয়াসমিন*

পেশাগত আদর্শে শিশু জিজ্ঞাসাবাদ ও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

হিজাব-নিকাব পরিহিত দু'জন নারী কক্ষে প্রবেশ করলো, এদের মধ্যে একজন ফুঁফিয়ে কান্না জুড়ে দিল। বসার সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন মুখের আবরণ খুলেই হাত কচলাতে কচলাতে বলতে থাকে– 'আন্টি, আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচান; আমি সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চাই; বদমাশটাকে অ্যারেস্ট করুন; তাকে শাস্তি দিন; আমাকে নিরাপত্তা দিন, আমি পড়ালেখা করতে চাই ইত্যাদি।' কথাগুলো শুনতে শুনতে তাৎক্ষণিকভাবে কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথমজন মুখের নেকাব খুলে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। তার মুখ দেখেই আমি তো হতভম্ব, একি! এমন বিধ্বস্ত সকরুণ অবস্থায় কাকে দেখছি! উনি তো আমার অতি পছন্দের একজন। তার পাশে শান্ত-স্নিগ্ধ ফুটফুটে কিশোরীটাই বা কে হন! তাদের দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে শান্ত হতে দিয়ে কথা প্রসঙ্গে যা জানতে পারলাম তা ভয়ঙ্কর নোংরামী-নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন এবং মনুষত্বের চরম বিপর্যয়। একজন শিশু তার পরম আপনজন কর্তৃক নির্ভরতার আশ্রয়, নিজ ঘরে দিনের পর দিন মুখ বুজে, দাঁত চেপে, ভীত-প্রকম্পিত হয়ে যে ধরনের নির্মম-নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। এভাবে মানবিক-মানসিক ও আইনি সেবার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নারী ও শিশু সহায়তা কেন্দ্রে প্রায় প্রতিদিন অসহায়, নিপীড়িত-নির্যাতিত নারী ও শিশু আসেন। যাদের অনেকে আসেন একান্ত গোপনীয় অব্যক্ত মনের কথা ব্যক্ত করে মনোঃসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা নিয়ে সুস্থ হতে, অনেকে আসেন আইনি প্রতিকার পেতে।

অত্র সহায়তা কেন্দ্রে এসে সেবা নিয়ে তারা সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করছেন। নারীটি পারিবারিক আয়োজনে পিতৃহীন আড়াই বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বর সেই প্রথমদিন থেকে শিশুটিকে আপন কন্যাসম করে লালন-পালন করতে থাকে। খাওয়ানো-পরিধান-গোছল এমনকি বাহিরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ইতিমধ্যে দুই বছরের মধ্যে নারীটি পুত্রসন্তানের জননী হন। জৌলুসপূর্ণ কাজ করার সৌজন্যে তাঁকে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে নাম-ডাক-সুনামের জন্য সুখ যেন

* অ্যাডিশনাল ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ

উতলে পড়ছিল। বাড়িতে মুরব্বী-গোচের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ছিলেন সন্তানদের খেয়াল রাখার জন্য। স্বামী ও মুরব্বীর পরম নির্ভরতা ও তত্ত্বাবধানে দুই সন্তানকে রেখে তিনি ভালোই ছিলেন। শিশুকন্যাটিও নামী-দামী স্কুলেরমেধাবী ছাত্রী। বয়ঃসন্ধিকালে ধীরে ধীরে তার পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে থাকে। প্রাণচাঞ্চল্য মেয়েটি ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে। স্কুলের কর্ণারে, বাসার বারান্দায় একাকী বসে কী যেন ভাবে, নিজের প্রতি চরম অবহেলা দেখাতে থাকে। নিজের হাতের আঙ্গুল ও নখ কামড়াতে কামড়াতে এবড়ো-থেবড়ো করে ফেলে, বন্ধুরা কিছু জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যায়, রেগে যায়; কখনো চুপ করে বসে থাকে; এর জন্য বন্ধুরাও এগিয়ে চলা শুরু করে। পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, ফলাফলও খারাপ হতে থাকে, মাঝে মাঝে অসহায়ত্বের বিষয়টি বুঝে। ক্লাসে গিয়ে চুপিসারে কাঁদে। একদিন তার ধৈর্য ও সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়, ক্লাসে ডুকরে কেঁদে ওঠে, বন্ধুরা তার অসহায়ত্তের বিষয়টি বুঝে স্কুলের মনোঃবিশেষজ্ঞের কাছে সবকিছু বলে এবং তিনি বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানান। শিশুটির মা'কে স্কুলে ডেকে সবকিছু বলা হয়। দিনের পর দিন সেই ছয় বছর বয়স থেকে সৎ বাবা কর্তৃক শিশুটি যৌন নির্যাতনের শিকার। প্রথমে সে বাবার স্পর্শকে পিতৃতুল্য আদর বলে জানতো; ধীরে ধীরে সেই আদর সীমালঙ্ঘন করলে তার খারাপ লাগা শুরু হয়। তারপর সেই নরপশু ভয় দেখিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে নিপীড়ন চালাতে থাকে। এমনকি দুই ভাই-বোন একই ঘরে আলাদা আলাদা বিছানায় ঘুমালে নরপশুরূপী বাবা রাতের আঁধারে কন্যাশিশুটির বিছানায় এসে তাকে নোংরা আদর করতো। তার নয় বছর বয়সী আদরের ভাইটি সেটা বুঝতে পেরে তার বাবার গায়ে থু থু দিতো, ঠেলা মারতো, আঁচড় দিত, ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিতো। স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে মা খেয়ালী মনে সংসার-ধর্ম পালন করতেন। সন্তানের প্রতি তার দেখভালকে পরম মমতা ভেবে নির্ভরতায় দিনানিপাত করতেন। শিক্ষকের নিকট শুনে সন্তানকে জিজ্ঞেস করলে সে সবকিছু খুলে বলে, ছোট্ট পুত্রটিও সাক্ষী হিসেবে মাকে তার দেখা ও বোধের সবকিছু বলে। ভদ্রমহিলা বোবা কান্নায় আড়ষ্ট হন। সন্তানদের নিয়ে মায়ের বাসায় চলে যান। স্বামীকে চ্যালেঞ্জ করলে নরপশু স্বামী তার স্ত্রী তথা সন্তানের মাকে বলে, শিশুকন্যাটি তাকে প্রলুব্ধ করে, তাই সে শিশুটির সঙ্গে এরকম আচরণ করে। যদি নরপশুকে নোংরা আদর করতে দেওয়া না হয়, তাহলে সব খরচ বন্ধ করে দিবে এবং শিশুটির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিবে বলে শিশুসহ মাকে বিভিন্ন ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ শিশু নিপীড়ন তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। একপর্যায়ে শিশুটিকে নরপশু বিবাহ করতে চায়। এরপর কন্যাটি-সহ মা অত্র সহায়তা কেন্দ্রে এসে মানসিক ও আইনি সেবার মাধ্যমে তারা প্রতিকার চান। তাদের জীবনের ক্রান্তিকালে অত্র সহায়তা কেন্দ্র পরম নির্ভরতার আশ্রয় হয়। তারপরও মিডিয়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের শিশু নির্যাতনের খবরে শঙ্কিত মা মনের গহীনে দানা বাধার শঙ্কায় মাঝে মাঝে ফোন করে মনের কথা শেয়ার করেন।

সর্বযুগে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংস পরিবার, সমাজ ও দেশের সবচেয়ে

স্পর্শকাতর সমস্যা। নারী ও কন্যাশিশুরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিয়ত ঘরে-বাইরে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, পাচার, অপহরণ, যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি বা উত্যক্তকরণ এবং পাশবিক নির্যাতনের শিকার হওয়া-সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ধরনের সহিংসতাকে চিহ্নিত করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের অধিক সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে আইনি সহায়তা, ভিকটিমদের সুরক্ষা ও আশ্রয় প্রদান, নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার।

বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতি থেকে আসা শিশুদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা দেওয়া, তাদের পরিবারকে খুঁজে বের করা, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়া এবং শিশুদের পুনরুদ্ধার পুরো প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ সযত্ন হওয়া জরুরি। প্রায়ই তথ্য সংগ্রহ করতে হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যে। কখনো এমন সময়ে যখন শিশুটির পক্ষে তথ্য দেওয়া হয়তো খুবই কঠিন। সঠিক ও যথেষ্ট তথ্য দেওয়া অনেক সময় শিশুটির পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে, বিশেষ করে তার মানসিক ও শারীরিক স্থিতি এবং নানা কারণে তৈরি হওয়া তার অবিশ্বাস, ভয় বা নীরবতার জন্য। ফলে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাতে থাকে ভুল-ভ্রান্তি, কখনোকখনো জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি সঠিক না হওয়ার ফলে তা শিশুর সুস্থতা ও অধিকার-বিরুদ্ধও হয়ে পড়ে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে নৈতিকতা, সুরক্ষা এবং শিশুবান্ধব পদ্ধতি– এই তিনটি নীতির ওপর শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের অর্থ শিশুর কাছ থেকে কেবল তথ্য সংগ্রহ করাই নয়, তার জন্য নিরাপদ সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও তার বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার মধ্যে দিয়ে শিশুটির মানসিক শুশ্রূষা করা।

শিশুটির মনের ওপর চাপ পড়বে বুঝতে পারলে কখনই সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত নয়। কিছু তথ্য যেমন যৌন নির্যাতনের ঘটনা বা পরিবার সম্পর্কে কিংবা পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কথা হয়তো শিশুটির মনে আঘাতের ক্ষতকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারে। সেই কারণে শিশুদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের কাজে প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়েই এই তথ্য সংগ্রহ করানো উচিত। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার রয়েছে সেই রকম প্রশিক্ষিত ও দক্ষ পেশাদার নারী অফিসারগণ।

শিশুটি কেমন বোধ করছে

প্রত্যেক শিশু সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হয় নানা ধরনের অনুভূতি নিয়ে। এই অনুভূতিগুলো শিশু এবং সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করতে পারে এবং তার ওপর নির্ভর করতে পারে কতটা তথ্য শিশুটি দেবে।

সাক্ষাৎকারগ্রহীতাকে বুঝতে হবে শিশুটি কেমন বোধ করছে। সাক্ষাৎকারগ্রহীতাকে সহমর্মিতা বোধ করা জরুরি। শিশুটিকে কাউন্সেলিং করা সাক্ষাৎকারগ্রহীতার কাজ না হলেও, তার আবেগের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া ও সাড়া দেওয়াটা প্রয়োজন, যাতে শিশুটি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে।

শিশুটি কী ধরনের আবেগ প্রকাশ করছে দেখে তাকে বিচার করবেন না, খেয়াল রাখতে হবে যে শিশুটির কোনো তীব্র অনুভূতি থাকতে পারে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি, অথবা তার নিজের জীবনের পরিস্থিতির প্রতি। এবং সেই অনুভূতি (বিশেষত রাগ ও অবিশ্বাস) সাক্ষাৎকারকারীর ওপর বেরিয়ে আসতে পারে। অতএব এই ঘটনা ব্যক্তিগত আঘাত হিসেবে না দেখাই ভালো। অনেক সময় শিশুরা যে তীব্র আবেগ নিয়ে সাক্ষাৎকারে আসে, তা সরাসরি প্রকাশ করে না। এগুলো প্রকাশ পায় তার অবিশ্বাস, বিদ্বেষ বা কথা বলায় অনীহার মধ্য দিয়ে। অনেক সময়ই এই ধরনের আচরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তীব্র আবেগ। তাই আমাদের বুঝতে হবে, শিশুটি কেন এমন ধরনের আচরণ করছে, আর তার আবেগের সূত্র কোথায় লুকিয়ে আছে। আমাদের বুঝতে হবে শিশুটি যে কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছে যৌনকর্ম, ধর্ষণ, পরিত্যাগ, শোষণমূলক শ্রম বা অন্য কিছু।

সেই কঠিন পরিস্থিতিতে শিশুটির অনেক নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে যৌন নির্যাতন, মারধর, অবহেলা, বন্দী করে রাখা অথবা মা-বাবার থেকে আলাদা হয়ে পড়া। এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা শিশুটির শরীর ও মন দুইয়ের ওপরই প্রভাব ফেলেছে। শারীরিক প্রভাব এই ধরনের অভিজ্ঞতা তার শরীরের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে। যেমন, অবহেলার ফলে অপুষ্টি; যৌন নির্যাতনের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়া বা এইচআইভি/এইডস-এর মতো অসুখ; কোনো ধরনের শ্রমের ফলে জখম হতে পারে শরীর।

মানসিক প্রভাব খুবই ভয়াবহ হতে পারে। নির্যাতনের ফলে দেখা দিতে পারে উদ্বেগ, ভয়, অপরাধবোধ, আশাহীনতা বা বিষণ্নতা। অনেকে দুঃস্বপ্ন দেখে, অবাঞ্ছিত স্মৃতি ও অস্বস্তিকর ভাবনা ফিরে ফিরে আসে। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক শিশু অন্তর থেকে গুটিয়ে যায়, বিষণ্নতা, উদাসীনতা বা অনুভূতিহীনতায় ভোগে। কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় আবেগের তীব্রতা-অতিরিক্ত রাগ, বিক্ষোভ ইত্যাদির আকারে, যা অনবরত প্রকাশ পায়। এই অবস্থা থেকে শিশুদের নিরাময় হতে দীর্ঘদিন লেগে যায়।

এই মানসিক পরিস্থিতি প্রকাশ পায় নানাবিধ আচরণের মধ্যে দিয়ে। শিশুটি হয়তো নিজের ক্ষতি করে স্নেহ ও মনোযোগ পেতে চায়। কখনো বা রাগ প্রকাশ করে, আত্মহত্যার চেষ্টা করে অথবা কোনো কাজে যোগ দেওয়া বা খেতে অস্বীকার করা ধরনের আচরণও করে থাকে। তাই শিশুটি যখন সাক্ষাৎকার দিতে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে এই ধরনের তীব্র আবেগ। তার কোনোটা প্রকাশ করে সরাসরি। কোনোটা বা

চাপা থাকে মনের মধ্যে। এছাড়াও, সে সাক্ষাৎকারের সময় এমন অনেক আচরণ করতে পারে, যা সে বাবা-মা বা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে করে না। সাক্ষাৎকারগ্রহীতাকে কর্তৃপক্ষের প্রতিভূ বিবেচনা করে সাক্ষাৎকারের অবকাশে তার যাবতীয় আবেগ প্রকাশ করে ফেলা অস্বাভাবিক নয়।

সাক্ষাৎকারগ্রহীতার ভূমিকা শুধু তথ্য সংগ্রহ করাই নয়। এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য ও শিশুটির আবেগের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এবং শিশুটির যা মনে হচ্ছে সে তা প্রকাশ করতে পারে। তাই সাক্ষাৎগ্রহীতাকে সচেতন থাকতে হবে যে শোষণ ও নিপীড়নমূলক পরিস্থিতি থেকে শিশুটি এসেছে; নেতিবাচক অনুভূতিগুলো তার ফলে তৈরি হয়েছে; ওই অভিজ্ঞতার শারীরিক ও মানসিক পরিণামতার প্রভাব শিশুটির নানা ধরনের আচরণে যেভাবে প্রকাশ পাবে।

মনে রাখতে হবে সাক্ষাৎকারের সময় শিশুটির আচরণে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা তার মনের ভেতর যা চলছে তার অংশমাত্র। আমাদের বৃহত্তর ছবিটা খেয়াল রাখতে হবে শিশুটির জীবনের ইতিহাস এবং তার অনুভূতি কোথায় সূত্রপাত হয়েছে। বুঝতে হবে কী জটিল এবং কঠিন ঘটনা পরম্পরার ফলে শিশুটি এই ঘরে উপস্থিত হয়েছে সাক্ষাৎকার দিতে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শ

আন্তর্জাতিক আইন, পেশাদারি নৈতিকতা এবং সাধারণ বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী ন্যূনতম নৈতিক আদর্শ মেনেই সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত। এই আদর্শ মেনে চললে শিশুটি সুরক্ষিত থাকবে শুধু নয়, এটি সাক্ষাৎকারগ্রহীতাকেও সাহায্য করবে অনেক বেশি তথ্য পেতে।

সর্বাধিক শিশুর স্বার্থরক্ষা: জিজ্ঞাসাবাদের আগে শিশুর প্রয়োজন, তার সুরক্ষা এবং কল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়া। প্রত্যেকের কর্তব্য শিশুটির স্বার্থ সর্বদা রক্ষা করা, এবং আপনি সেদিকে নজর রাখতে ভুলবেন না। উদাহরণ: শিশুটি খুবই ছোটো এবং সে ধর্ষিত। তাকে ধর্ষণকারী সম্পর্কে প্রশ্ন করা জরুরি। শিশুটির স্বার্থে আপনি যতক্ষণ না নিশ্চিত হতে পারছেন যে এই প্রশ্নগুলোর ফলে সে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ততক্ষণ এই প্রশ্নগুলো না করা।

সজ্ঞান সম্মতি: যে কোনো সাক্ষাৎকারেরই এটি একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এর উদ্দেশ্য সাক্ষাৎকার সম্পর্কে শিশুটিকে জানানো এবং এই বিষয়ে তার সম্মতি নেওয়া। শিশুটিকে সাক্ষাৎকারের কারণ, বিষয়বস্তু, কীভাবে এই তথ্য ব্যবহার হবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া আবশ্যক। কোনো সাক্ষাৎকার-ই নেওয়া হবে না যদি না শিশুটি সম্পূর্ণ এবং অপ্রভাবিতভাবে তাতে সম্মতি দেয়। শিশুটিকে জানানো এবং তার সম্মতি নেওয়া সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ করে তোলে এবং শিশুটিও

অনেক বেশি ভরসা করতে পারে, অতএব তথ্য দিতেও ইচ্ছুক বোধ করে থাকে। বহু দেশে, সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে লিখিত সম্মতির প্রয়োজন হয়। যদি সে ব্যক্তি লিখতে পড়তে না পারে, নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতিতে মৌখিক সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে। শিশুটিকে জিজ্ঞেস করা দরকার যে সে সাক্ষাৎকার দিতে ইচ্ছুক কিনা। যদি সে সম্মতি না দেয়, তবে সেই সাক্ষাৎকার কখনোই নেওয়া যায় না।

শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সাক্ষাৎকার নেওয়ার মধ্য দিয়ে শিশুটিকে মানসিক আরোগ্য লাভে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম প্রচেষ্টা হওয়া জরুরি। অনেক সময়ই সাক্ষাৎকারের সময় একটি শিশু ভয়, অবিশ্বাস এবং সত্যি বললে কী হতে পারে সে সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আসে। এই ধরনের সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় আমরা এমন কৌশলে শিশুটির সঙ্গে কথাবার্তা বলি, যাতে সে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয় এবং সে যা চায়, তাই-ই বলতে পারে। আমরা আমাদের হৃদয় এবং মন দিয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, তার সহমর্মী হওয়ার প্রচেষ্টা করি এবং চেষ্টা করি তার বিশ্বাস গড়ে তোলার। আমরা সাক্ষাৎকারটি এমন পরিস্থিতিতে করার চেষ্টা করি, যাতে সে স্বাচ্ছন্দ এবং সুরক্ষিত বোধ করে।

এই ধরনের সাক্ষাৎকারের মূল কথাই হলো শিশুটিকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া। এই সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করা দরকার তা হলো শিশুটিকে কোনো বাধা না দিয়ে তার সম্পূর্ণ বক্তব্য বলতে দেওয়া; তার অভিব্যক্তিকে কোনোভাবে প্রভাবিত না করা; একটি নিরাপদ পরিস্থিতি তৈরি করা, যাতে শিশুটি নিজের মতামত প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে; শিশুটিকে তার নিজের ভাষা এবং বাচনভঙ্গিতে কথা বলতে দেওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনে অনুবাদকের সাহায্য নেওয়া; তার কোনো ক্ষতি না করা ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসাবাদীদের বুঝতে হবে যে নির্মম-নিষ্ঠুরতার শিকার; পাচার হয়ে যাওয়া এবং যৌন নির্যাতনের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের মনের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং খুব সহজেই তার পুরানো আঘাতের ক্ষত নতুন করে জেগে ওঠতে পারে। কখনো যদি মনে হয় যে সাক্ষাৎকার নেওয়ার ফলে শিশুটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে সেই সময়ে শিশুটির সাক্ষাৎকার না নেওয়াই ভালো। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় মূলত দু'ভাবে শিশুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে: ১. এমন ধরনের প্রশ্ন, যে তার ফলে শিশুটির মানসিক চাপ বা আঘাতের ক্ষত বেড়ে যাওয়া এবং ২. যথেষ্ট গোপনীয়তার ব্যবস্থা না থাকার ফলে তথ্য ছড়িয়ে পড়া, যার ফলে পাচারকারী, অত্যাচারী ব্যক্তি বা পরিবারের লোকের দ্বারা শিশুটির ক্ষতিসাধন। উদারণস্বরূপ: আপনজন কর্তৃক যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার চাওয়ায় পর শিশুকে হত্যা করা অঙ্গহানি, লুকিয়ে রাখা, মৃত্যুর হুমকি দেওয়ার ঘটনার নজির আছে। আপন নানার বিরুদ্ধে ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর জনৈক আসামী/নানা আত্মহত্যা করেছিল। আবার জানাজানি হবার পর ভিকটিম লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যা করেছিল।

কমিউনিকেশন বা ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শোনার প্রাসঙ্গিকতা

ভাবের আদান-প্রদান বা কমিউনিকেশনের মূলকথা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন প্রত্যেক সাক্ষাৎকারগ্রহীতার ক্ষেত্রেই জরুরি। শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের দুটি লক্ষ্য শিশুটির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এই সাক্ষাৎকারের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিশুটির মানসিক আরোগ্য লাভে সহায়তা করা। এই দুই কারণেই শিশুটিকে খোলামেলা ও স্বাধীনভাবে কথা বলার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। শিশুটি যদি বোধ করে যে সাক্ষাৎকারগ্রহীতা তার কথা শুনতে আগ্রহী নয়, তবে সে মন খুলে কথা বলতেই চাইবে না।

সংবেদনশীল/অসংবেদনশীল প্রশ্ন: 'সংবেদনশীল'এবং 'অ-সংবেদনশীল' প্রশ্নের তফাৎটা বোঝা জরুরি। 'সংবেদনশীল' প্রশ্ন, যা শিশুটির ওপর মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে কিংবা তার মানসিক আঘাতকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারে। যেমন, যৌন নির্যাতন, শোষণ, অত্যাচার, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা, নেশা করার অভ্যাস বা পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলি। শিশুটির মানসিক সুস্থতা ও তার কল্যাণের কথা মনে রেখে এই ধরনের প্রশ্ন শুধু প্রশিক্ষিত ব্যক্তি, যেমন, ডাক্তার, মনোবিদ, কাউন্সেলার বা সমাজকর্মীদের করতে দেওয়া উচিত।

শনাক্তকরণ সম্পর্কিত প্রশ্ন: এই ধরনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য শিশুটির আইনি অবস্থান নির্ধারণ করা, বিশেষত যদি শিশুটি কোনো অপরাধের শিকার, যেমন, শিশুপাচার বা শিশুশ্রমের শিকার হয় বা সে যদি দেশের অন্য কোনো প্রান্ত থেকে অথবা আশপাশের দেশ থেকে এখানে চলে এসে থাকে। এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কোনো সমাজকর্মী, আইনি পরামর্শক এবং একজন মহিলা পুলিশের উপস্থিতি সেখানে আবশ্যক, বিশেষত শিশুটি যদি খুবই ছোটো কিংবা মেয়ে হয়ে থাকে।

পরিবার শনাক্তকরণ সম্পর্কিত প্রশ্ন: শিশুটির বাড়ি কোথায়, পরিবারের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন। শিশুটি প্রথমে হয়তো এই তথ্য দিয়ে অনিচ্ছুক হতে পারে এবং প্রয়োজনে একাধিক সাক্ষাৎকার নেওয়ার দরকার হতে পারে। কখনো হয়তো পরিবার সম্পর্কিত প্রশ্নে শিশুটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েও পড়তে পারে, বিশেষত যদি পরিবারের কারো দ্বারাই সে যৌন নির্যাতন হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারগ্রহীতা যদি মনে করেন বিষয়টি 'সংবেদনশীল', তবে তিনি কাউন্সেলার বা সমতুল্য কোনো ব্যক্তির কাছে সুপারিশ করতে পারে সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ করার জন্য।

জীবন-ইতিহাস (কেস হিস্ট্রি): শিশুটির নির্যাতন ও শোষণ এবং যেভাবে সে এই পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকারগ্রহীতা শিশুটিকে তার নিজের ভাষায় সম্পূর্ণ ঘটনাবলি বলতে দেন। তথ্যায়নের সময় সেই সঙ্গে যোগ করেন ঘটনার সংক্ষেপসার।

সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন: এই জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করা হয়, যাতে অপরাধকারীদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তি দেওয়া যায়। এই সাক্ষাৎকারে সংঘটিত অপরাধ, যেমন পাচার বা ধর্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আদালতে ব্যবহার করার জন্য বলে এই তথ্য অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার উপযুক্ত সময় তখন, যখন শিশুটি তার অতীতের পরিস্থিতির মানসিক চাপ কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে এবং সাক্ষাৎকারগ্রহীতার প্রতি তার একটা ভরসা তৈরি হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ে নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়।

শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ

শিশুদের প্রয়োজন ও সংবেদনশীলতা বড়দের থেকে ভিন্ন। তাই তাদের বিশেষ নজর ও যত্ন আবশ্যক। শিশুর পক্ষে হিতকারী পদ্ধতি কেবল সাক্ষাৎকার গ্রহণই নয়, কোর্টের কার্যপ্রণালী, হোমের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য।

✦ **সাক্ষাৎকার গ্রহণকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি শিশুটির মানসিক শুক্রষা করার কাজে ব্যবহার করুন:** সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুটিকে সহায়তা করা ও নিরাময় করে তোলাও সম্ভব। তার প্রয়োজনের কথা শুনুন, তা মেটানো যায় কিনা দেখুন। শিশুটিকে সুরক্ষিত বোধ করতে সাহায্য করুন। ছোট শিশু এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগ্রহীতা নারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

✦ **শিশুটির নিজেকে মেলে ধরতে সাহায্য করুন:** বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে 'খোলা মনে প্রশ্ন করুন, যাতে একটা কথোপকথন শুরু করা যায়। এবং শিশুটি নিজের মতো কথা বলে যেতে পারে। আপনি যা শুনতে চাইছেন, তা না বলে সে যদি অন্য কথা বলতে থাকে, একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি ওর উত্তরকে প্রভাবিত করবেন না। অপেক্ষা করুন ও কী বলে তা শোনার জন্য।

✦ **সহমর্মিতা:** নিজের হৃদয়কে ব্যবহার করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন শিশুটির অনীহা, ভয় ও ক্লান্তিকে। সেই সঙ্গে আদৌ সে সাক্ষাৎকার দিতে সক্ষম কিনা অথবা তার প্রয়োজনগুলোই বা কী।

✦ **শিশুটির বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করুন:** শিশুটির কাউকে বিশ্বাস করতে পারা জরুরি। তার বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। শিশুটির সঙ্গে কথাবার্তায় সততা রক্ষা করুন। নিজের মনকে খোলা রাখার চেষ্টা করুন, যাতে সে সহজেই নিজের আবেগ প্রকাশ করতে পারে। সে যদি কোনো গোপন কথা আপনাকে বলে, সেটা গোপন রাখারই চেষ্টা করুন। যদি না সে কথার চিকিৎসাগত, আইনি বা মানসিক কোনো মাত্রা থাকে।

✦ **শিশুটিকে রক্ষা করুন:** সাক্ষাৎকারের আগে শিশুটির সুরক্ষা বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিন। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। শিশুটি যদি তার সুরক্ষা বিষয়ে কোনো আশঙ্কা প্রকাশ করে, তা গুরুত্ব দেবেন। এমনকি, যদি মনে হয় শিশুটি অতিরঞ্জিত করে বলছে, বা মিথ্যে বলছে অথবা অবাস্তব কিছু বলছে, তবুও। বন্ধুত্বপূর্ণ, আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করুন: যে ঘরে সাক্ষাৎকার নেবেন, তা যেন নিরিবিলি হয়, যাতে শিশুটি স্বাচ্ছন্দবোধ করতে পারে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, মানবিক-মানসিক আইনি সেবার সমন্বয়ে কাজ করে যাচ্ছে নারী সহায়তা ও তদন্ত বিভাগ। এই সেন্টারে প্রতিটি সদস্য তাদের কর্তব্য পালনে সদা তৎপর। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঘরে ফিরে যায় হারানো শিশু, বিপদে আঁকড়ে ধরার হাতিয়ার খুঁজে পায় নির্যাতনের শিকার হওয়া নারী ও শিশু এবং বিভিন্ন ধরনের সংকটে মানসিক ও আইনগত সহায়তা পেয়ে নিজেকে সামলে ওঠার শাক্তি পায় বিভিন্ন নির্যাতনে অসহায় নিপীড়িত শিশু ও নারী। সীমিত সামর্থ্য ও অবকাঠামো কোনো কিছুই নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহযোগিতা করা থেকে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারকে পিছপা করতে পারবে না, যদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সহায়তা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ পুলিশ নিরলভাবে দেশ মানবতার জন্য সমাজের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তারপরও মানবতার জন্য প্রকৃত সেবা বলে যদি কিছু থাকে তা ঢাকা মেট্রোপলিটন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের নারী অফিসারবৃন্দ দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নীরবে-নিভৃতে দিয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা, নীরবতা, স্বকীয়তা ও বিশ্বস্ততা বজায় রেখে।



ফাতিমা পারভীন*

কন্যাসন্তান সৌভাগ্যের নিদর্শন

৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। প্রতিটি দিবসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, জাতীয় কন্যাশিশু দিবসও তার ব্যতিক্রম নয়। এই দিবসটির সূচনালগ্ন থেকে গৃহে কন্যাসন্তানের প্রতি বিনম্র ভালবাসা ফুটে ওঠে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে দেখা যায়জাতীয় কন্যাশিশু দিবসকে ঘিরে কন্যাসন্তানের প্রতি মা-বাবার এক অন্যরকম অনুভূতি প্রকাশ পায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক সাড়া। পরিবারে কন্যাসন্তানের প্রতি মর্যাদার স্বীকৃতি। পিতার অনুভূতি প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয় কন্যারা।

আসলেই পৃথিবীর সকল পিতার নির্মল আনন্দ ও ভালোবাসা রয়েছে কন্যাসন্তানের প্রতি। সকল পিতার মধ্যে কন্যার প্রতি রয়েছে মমত্ববোধ। পৃথিবীতে একজনও হৃদয়হীন পিতা-মাতা নেই, যদিও অনেক হৃদয়হীন সন্তান রয়েছে। আগে কন্যাসন্তানের প্রতি চরম উদাসীনতা থাকলেও বর্তমানে কন্যাসন্তানের প্রতি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের চির অবসান ঘটিয়ে কন্যাসন্তান এখন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আশীর্বাদ হয়ে ওঠেছে।

কন্যাসন্তান হলে অনেক বাবা-মা মন খারাপ করেন। অথচ মা-বাবার জন্য জান্নাতের দাওয়াতনামা নিয়ে দুনিয়াতে আগমন ঘটে কন্যাসন্তানের। তাই কন্যাসন্তান মুসলিম পরিবারে এক অনন্য উপহার। মহান আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপরে যখন সবচেয়ে বেশি খুশি থাকেন, তখন গৃহে কন্যাসন্তান উপহার দেন। অর্থাৎ মা-বাবার জন্য কন্যাসন্তান মহান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। হযরত আবদুল্লাহ উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তা'আলা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।' (কানযুল উম্মাল ১৬:৬১১)

তাই গৃহে কন্যাসন্তানের আগমনের পর সন্তুষ্টচিত্তে তাদের লালন-পালন করা একান্ত

*** নারী ও শিশু অধিকারকর্মী ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ, বরগুনা**

আবশ্যক। তবে আমাদের পরিবারতন্ত্রে কন্যাসন্তানেরা সবধরনের কাজ করবে, পরিবার ও সমাজের সবকিছুতে সমান ভূমিকা রাখবে এই মানসিকতা এখনও মানুষের মনে তৈরি হয়নি। বাইরে কাজ করতে গেলে এখনও অনেক কন্যাকে তার পরিবার থেকে অনেক কথা শুনতে হয়। পরিবারের কাজগুলো সেরে তারপর বাইরে বের হতে হয়। আর বাইরের কাজেও বাজে অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়। নেতৃত্বের কথা বাদ দিলাম। নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কন্যাদের এখনো কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে নারীরা শীর্ষ পদে আসীন হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের যোগ্যতা যতোই হোক না কেন, তার অবস্থান বাস্তবে আলোর সংস্পর্শে আসে অপ্রতুলভাবে।

তবুও আমাদের কন্যারা পিছিয়ে নেই। এগিয়ে যাচ্ছে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে পিছিয়ে পড়া অনেক কন্যানিজের হাতে বানানো জিনিস বিক্রি করে উপার্জন করে। সেক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তারপরও এখনও অত্যাচার, নির্যাতন, অবমূল্যায়নসহ নানামুখী সমস্যা পার করতে হয় কন্যাসন্তানের। তবে আশার আলো হলো, আজ কন্যাসন্তানেরা নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে অনেকেই বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় প্রধান পদে দায়িত্ব পালন করছেন পুরুষের সমান তালে। সাংবাদিকতায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সফল ও প্রশংসিত হচ্ছে অনেক নারী। এছাড়াবিজ্ঞ আইনজীবী ও বিজ্ঞ বিচারকের দায়িত্বে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন অনেকেই। ডাক্তার, পুলিশ ও প্রকৌশলী থেকে শুরু করে যোগ্য জনপ্রতিনিধিদের অধিকাংশ তালিকায় রয়েছে তাদের নাম।

একদিন আমিও কন্যাসন্তান হয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেম। তারপর আমি ও আমার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কন্যাসন্তানের প্রতি অনেক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খুব কাছ থেকে দেখেছি। ১২-১৩ বছর বয়সী কন্যাসন্তানকে জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ দিতে আমি দেখেছি। পরবর্তীতে তাদের বিদ্যালয় থেকে অকালে ঝরে পড়তে ও তাদের পরবর্তী জীবনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির শিকার হতেও আমি দেখেছি। কত অপ্রত্যাশিত ঘটনা দেখে নীরবে একাকী উৎকণ্ঠায় সময় পার করেছি। তখন নিজেকেও ওই দুঃসময়ের কাছে অসহায় মানুষ মনে হয়েছিল। অনেক ঘটনাবহুল কালের সাক্ষী হয়ে আছি। কখনো সমাধান করেছি, আবার কখনো আইনি সহায়তা দিয়েছি।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস এলেই মনে পড়ে আমার উপজেলার একটি মামলার তদন্ত ও এডিআর পদ্ধতিতে মিমাংসা করতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিলাম আমি। দুটি কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ার কারণে মায়ের ঘর ভাঙতে দেখেছি খুব কাছ থেকে। ওই কন্যাসন্তানের অসহায়ত্বের চাহনি আজও আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। বিবেক দংশন করে। তাদের পিতৃগৃহে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম, শেষমেশ হেরে গিয়েছি। পাষাণ বাবা পালিয়ে দেশত্যাগ

করেছেন। প্রত্যেক জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে তাদের কথা মনে পড়ে। শত ব্যস্ততা উপেক্ষা করে কিছু সময় ওদেরকে দিয়েদিই। আমি জানি ওদের কষ্ট। ওদের হাসিতে হাসি, তারপরও ওদের হাসির অন্তরালে মলিনতা দেখি। অসহায়ত্বের চিহ্ন দেখি। পিতৃস্নেহের অভাব দেখি। বাবার অনাদর, অবহেলা ও অপ্রত্যাশিত জীবনের লড়াই নিয়ে ওরা বেড়ে উঠছে। তাই পাষ- বাবার প্রতি ধিক্কার আসে। ওই কন্যাসন্তানেরা অভাগী মায়ের আঁচলে ঠাঁই নিয়ে লেখাপড়া করছে। অনেক বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে বিভোর করে ওদের মাকে। বাবা ফেলে চলে গেলেও মমতার আঁচল সরাতে পারেনি অভাগী মা। হোক ওরা অনেক অনেক বড় হোক। বড় হয়ে পরিবার, সমাজ আর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করুক ওরা। বিশ্ব জয় করুক। ওদের বাবার মানবিকতার হৃদয়বৃত্তিতে আঘাত হানুক। ওরা বাংলার আলোকিত মানুষ হোক, বাতিঘর হোক কিংবা আলোকবর্তিকা হোক ওরা। আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন কন্যাসন্তান হয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। করোনা মোকাবিলায় বিশ্বে তাঁর প্রশংসনীয় উদ্যোগ অতুলনীয়। তিনিও কন্যাসন্তান হয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তাই কন্যাসন্তান শুধু পরিবারে নয়, বিশ্বের বুকে সেরাদের সেরা হয়ে মুখ উজ্জ্বল করতে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনিই।

পরিবারে কন্যাসন্তান পিতা-মাতার প্রতি যে খেদমত করেন তা অবশ্যই একটি বড়সড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া প্রত্যেক কন্যাসন্তান পরিবারের ভগ্নি, জায়া, জননী ও প্রেয়সী, তাই কন্যাসন্তান পারিবারিক সূত্রে আশির্বাদ।

আমি মনে করি, কন্যাসন্তানও হতে পারে আলোকিত মানুষ। বংশের একমাত্র পরিচয়। কন্যাসন্তানের কর্মফল দুটি পরিবারে (বাবা ও শ্বশুরবাড়ি) সুনাম বয়ে আনে। আবার কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যাসন্তানই হতে পারে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। কন্যাসন্তান অশুভ নয়, অকল্যাণকর নয়। অপ্রত্যাশিত কিংবা অবহেলিত নয়ম বরং কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়া খোশ কিসমতি ও সৌভাগ্যের নিদর্শন। আসুন, কন্যাসন্তানের প্রতি বিরূপ মানসিকতা পরিহার করি, তাদেরকে অবহেলার পাত্র না বানাই, তাদের যথাযথ বিকাশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে তাদের প্রতি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করি।



বিভুরঞ্জন সরকার*

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আগে বদলাতে হবে

বৈষম্য ও অসমতাই আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য। সমাজ থেকে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার করার আশা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলেও স্বাধীন লাভের পর অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও নানা ধরনের বৈষম্যই দেশের মানুষের ভাগ্যলিপি হয়ে রয়েছে। কত ধরনের বৈষম্যের যাঁতায়ই না আমরা পিষ্ট হচ্ছি প্রতিনিয়ত। সব মানুষ ভাই ভাই বলে একটি মুখরোচক স্লোগান অনেকের মুখে উচ্চারিত হলেও মানুষে মানুষে বৈষম্য এখনো প্রকট। আছে নারী-পুরুষে বৈষম্য, আছে ধর্ম নিয়ে বৈষম্য, আছে ধন্যবৈষম্য, জাত-পাতের বৈষম্যসহ কত বৈষম্য নিয়েই না আমাদের বাস।

নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কন্যাদের লেখাপড়া শিখিয়ে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। লেখাপড়া শিখে মেয়েরা আত্মনির্ভর হবে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পাবে, বৈষম্য কমিয়ে আনতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে – সম্ভবত এসব ভেবেই রোকেয়া নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এখন নারীরা শিক্ষায় এগিয়ে এলেও বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়নি। আগের তুলনায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাসহ নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও বাজেট স্বল্পতাসহ নিত্য-নতুন প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীশিক্ষার অগ্রগতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক ভালো হলেও কর্মক্ষেত্রে এবং উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যারা সক্রিয়, তারাও মনে করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আন্তরিকতায় অনেক কাজ হয়েছে। তবে এখনো আমাদের হোঁচট খেতে হচ্ছে। অনেক বিষয়ে উত্তরণ হলেও নিত্য-নতুন প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের হার কিছুটা বেশি হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেয়েরা এখনো

*** জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা**

পিছিয়েই আছে।

বলা হয়ে থাকে, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তো, কন্যাশিশুরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হলে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার আশা থাকে কী? মেধা, বয়োঃসন্ধিকাল, বিকাশ প্রক্রিয়া কর্মক্ষেত্র ও জীবনধারার মূল্যায়ন সব কিছুতেই কন্যাশিশুরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার। এক কথায় কন্যাশিশুর প্রতি এদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ এখনো বাংলাদেশের অনেক কন্যাশিশুর বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছরের আগেই। শিশুর ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর জন্য বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রচারণা চলছে গত কয়েক দশক ধরে। কিন্তু তারপরও কন্যাশিশুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের সময়কালে দেশের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৮ শতাংশের কিছু বেশি। গত বছরের তথ্য বলছে, প্রাথমিকের শিক্ষকদের মধ্যে ৬৪ দশমিক ২০ শতাংশই নারী। মাধ্যমিক স্তরে ১৯৯৮ সালের পর থেকে সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে আছে নারীরা। গত বছরই এই স্তরে নারী শিক্ষার্থী ছিল ৫৪ দশমিক ৮৬ শিক্ষার্থী। আর কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৫০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গত বছর গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, দেশের ১৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯ শতাংশ নারী শিক্ষক। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। ১৯৭৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। মঞ্জুরি কমিশনের ৪৭তম বার্ষিক প্রতিবেদনে মতে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালে মোট শিক্ষক ছিলেন ২ হাজার ৩১৭ জন। সে সময় নারী শিক্ষক ছিলেন ২০৩ জন অর্থাৎ ৮ শতাংশ। ৫০ বছরে এই হার বেড়েছে ২১ শতাংশ। ইউজিসির তথ্যমতে, বর্তমানে পুরুষ শিক্ষকদের চেয়ে ৭০ শতাংশ পিছিয়ে আছেন নারী শিক্ষকগণ। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই নয়, প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও নারী শিক্ষক বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুই বছর আগে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) এর তথ্যমতে, প্রাথমিক ও প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৫১ শতাংশ। দুই কোটি ১৫ লাখ ৫১ হাজার ৬৯১ শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী এক কোটি নয় লাখ ৯১ হাজার ৪৫১ জন। প্রাক্-প্রাথমিকে ৫০ দশমিক ৩০ শতাংশ নারী। ৩৯ লাখ ৪৭ হাজার ৮৫২ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ লাখ ৮৩ হাজার ৮৯২ জনই নারী। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে নারী শিক্ষকদের যে হারে এগিয়ে রয়েছে উচ্চশিক্ষায় সেভাবে এগিয়ে যেতে না পারলেও এই অগ্রগতিই একসময়

নারীদের এগিয়ে রাখবে। নারীর কাজের ক্ষেত্র এখন সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের দেশের অর্থনীতির অন্যতম বড় ক্ষেত্র পোশাক শিল্পে একটি বিপুল সংখ্যক নারী কাজ করছে। কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হলে নারীর উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে নারীশিক্ষায় গুরুত্বারোপ করার বিকল্প নেই। যে প্রতিবন্ধকগুলো এখনো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো দূর করতে হবে। বিশেষ করে বাল্যবিয়ের মতো সামাজিক অভিশাপ আজও বহু মেধাবী নারীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। তারা পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই ধ্বংস হচ্ছে। প্রতি বছর স্কুল-কলেজে পড়া বহু মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী আর অর্ধেক তার নর। কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা এই কবিতার লাইন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীর মঙ্গলময় সৃষ্টিতে নারীর রয়েছে সমান অবদান। অথচ আমাদের সমাজ আজও পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে নারীরা হয়রানির শিকার হয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে শিশু নির্যাতন-পাচারসহ সব ধরনের সহিংসতা বন্ধের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশ এখনো এই ক্ষেত্রে বেশিদূর এগোতে পারেনি। কন্যাশিশুর জন্য বাস্তবতা আরও ভয়াবহ। দেশে এখনো প্রায় প্রতিদিনই কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, যাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুও আছে। কোথাও কোথাও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। বাজার, রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ নিজের বাড়ির মধ্যে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক ও উত্ত্যক্তকারীদের মাধ্যমে কন্যাশিশুরা সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। দেশে অসংখ্য কন্যাশিশু নিয়মিত সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে মেসেজে উত্ত্যক্ত করা, বিকৃত ছবি পাঠানো ও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কন্টেন্ট পাঠানো। বেশিরভাগ ঘটনায়ই কেউ অভিযোগ করে না। অনেকে জানেনও না যে প্রতিকারের জন্য কোথায় যেতে হবে। তাছাড়া হুমকি ও অন্যান্য জটিলতার কথা বিবেচনা করে আইনি লড়াইয়ে যেতে অনেকেরই অনীহা আছে।

আমাদের দেশের সামাজিক ব্যাধিগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহ অন্যতম। দুর্নীতির মতো এই ব্যধিরও যেন সেরে ওঠার নাম নেই। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, পরিবারের সদস্যদের সিদ্ধান্তেই বাড়ির মেয়েকে বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনার খবর খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। রাজশাহীর দুর্গাপুর পৌর এলাকার জানে আলম জনি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানেন বলে একমাত্র ছোট বোনের বিয়েতে তাই তাঁর সম্মতি ছিল না। বোনকে তিনি আরও লেখাপড়া করাতে চান। অথচ তাঁর মা-বাবা প্রতিবেশী শফিকুল ইসলাম নামের এক ঘটকের প্রলোভনে ১১ বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিতে চান ৩২ বছর

বয়সী এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

জনি তাঁর মা-বাবাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছেন যে এত অল্প বয়সে বোনের বিয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁরা ছেলের কথা কানে না নিয়ে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই অবস্থায় উপায় না পেয়ে জনি থানায় যান। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও মেয়েটির মা-বাবাকে সতর্ক করে আসে। এরপরও যদি আবার বাল্যবিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

এ যাত্রায় তো অন্তত মেয়েটি বেঁচে গেল বাল্যবিবাহের হাত থেকে। কিন্তু যাদের এই মেয়েটির মতো ভাই নেই, তারা তো বাঁচতে পারে না!

চলতি বছরেই বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৩ প্রতিবেদনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহের হারে বাংলাদেশ এখনো শীর্ষে, আর বিশ্বে পঞ্চম। ২০০৬ থেকে ২০২২ সালের তথ্য তুলে ধরে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সের আগেই ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে; যা কিনা মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুঝুঁকিও আছে–এসব তথ্য আমাদের শঙ্কায় ফেলে দেয়।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ অনুসারে, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সী ছেলেরা বিয়ের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক। আবার বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা-২০১৮ অনুসারে, বিশেষ বিধানের আওতায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে।

সরকারের লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বাল্যবিবাহ নির্মূল এবং ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের বাল্যবিবাহ এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি নির্মূলের অঙ্গীকারও রয়েছে।

শুধু সরকারের অঙ্গীকার আর প্রচারণা কিংবা আইন-বিধান দিয়ে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়। সবার আগে পরিবারের সদস্যদেরই বুঝতে হবে যে বাল্যবিবাহ মানে স্বাস্থ্য ও মৃত্যুঝুঁকির জাল বুনে দেওয়া। তাই এই সমাজে জনির মতো ভাইদের খুব দরকার। তাঁরাই বাড়াবেন সচেতনতা, নির্মূল হবে বাল্যবিবাহ।

দুই.

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন' সংশোধন করে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। আগের আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। শাস্তি বাড়লে ধর্ষণ প্রবণতা কমবে কিনা, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। ধর্ষকদের কঠিন শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে যেমন মত আছে, আবার বিপক্ষেও যুক্তি আছে। শুধু আইন অপরাধ কমাতে পারে না। অপরাধ সংঘটনের বিদ্যমান কারণগুলো দূর না করলে অপরাধ অব্যাহত থাকবে বলে কেউ কেউ মনে করেন। নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা দেশে যে একটি বড় সমস্যা হয়েই দেখা দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে– এটা নিয়ে খুব একটা বিতর্ক আছে বলে মনে হয় না। কীভাবে সেটা সম্ভব তা নিয়ে আছে মতভিন্নতা।

নারীকে অধঃস্তন হিসেবে দেখার পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন বদল না হবে, নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার মানসিকতা যতদিন গড়ে না ওঠবে, ততদিন নারীকে অসম্মান এবং বৈষম্যের শিকার হতে হবে বলেই মনে করা হয়। নারীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ কুসংস্কার, পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে ইদানিং যুক্ত হয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী রাজনীতি। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করেই নারীদের অগ্রসর হতে হচ্ছে, বিজয় ছিনিয়ে আনতে হচ্ছে। পদে পদে বাধা, তারপরও বর্তমান সরকারের কিছু নারীবান্ধব নীতি-পদক্ষেপের কারণে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের যখন দৃশ্যমান অগ্রগতি দেশের বাইরেও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, প্রশংসিত হচ্ছিল, তখন নারী নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক।

শিক্ষার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও নারীরা আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসছেন। পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে নারীরা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস যথা গার্মেন্টস, হিমায়িত চিংড়ি, চামড়া, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, চা ইত্যাদি ক্ষেত্রের মোট শ্রমিকের বেশিরভাগই নারী। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মোট রপ্তানি আয়ের ৭৫ ভাগ উপার্জনকারী তৈরি পোশাক শিল্প খাতের শতকরা আশি ভাগ শ্রমিকই নারী। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলছেন নারীরা। তাদের অবদানে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। বিদেশে কর্মরত নারীরাও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

নারীদের এই সাফল্যের পেছনে এদেশের নারী ও মানবাধিকার কর্মীদের নিরন্তর লড়াই-সংগ্রামের পাশাপাশি সরকার ও রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তারপরও বাংলাদেশের নারীদের এই জয়যাত্রা কণ্টকহীন নয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নানান বৈষম্য-নির্যাতনের শিকার হয়েও নারীরা বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এখনো এদেশের নারীরা

প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অনেক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও প্রবল পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজাল থেকে তারা মুক্ত হতে পারছেন না। নারীর অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন বন্ধ করা। নারী নির্যাতনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষক্ষতির দিক অনেক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী আন্দোলনের অনেক বিস্তৃতি এবং নানান পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও নারী নির্যাতনের ঘটনা কমছে না। নিরাপত্তার অভাব নারীর স্বাভাবিক চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করে, নারীকে তার কর্মক্ষেত্র থেকেও পিছু হটতে বাধ্য করে।

নারী নির্যাতনের মূল কারণ কেবল ব্যক্তি হিসেবে নারীর প্রতি হীন ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, বরং নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে বিদ্যমান নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস ও নারী নির্যাতন দূরীকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন বেসরকারি, মানবাধিকার, নারী অধিকার সংগঠন ও সুশীল সমাজের ভূমিকা রাখার অবকাশ আছে। তবে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ও তার বাস্তবায়নের কাজটি মূলত রাজনৈতিক এবং চূড়ান্ত বিচারে রাজনৈতিক দলই কেবল এ কাজটি করতে পারে। নারী নির্যাতন রোধ এবং সমাজে বিরাজমান বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তনে এখন সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কোনো বিকল্প নেই।

এটা মনে রাখতে হবে, নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন মানে অন্য কারো স্থান দখল নয়, বরং রাজনৈতিক জীবনে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করাটাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। রাজনীতিতে এবং ক্ষমতা কাঠামো থেকে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারীদের বাদ দিয়ে কখনো সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিত্বহীনতা বা ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তির দিক হতে পারে না। জনসংখ্যার উভয় অংশের স্বার্থকে সমভাবে বিবেচনা করে নারী-পুরুষ যৌথভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ করলে গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে গতিশীলতা এবং গুণগত মান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

নারীর অগ্রগতির পথে নতুন এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে আসছে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। দেশকে সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করতে না পারলে নারীর পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া যেমন কঠিন হবে, তেমনি দেশের উন্নতি-অগ্রগতিও বাধাগ্রস্ত হবে। অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমরা বলতে পারি যে, নারীরা এগিয়ে গেলে দেশও এগিয়ে যায়। নারীদের পিছনে রেখে দেশের পক্ষেও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দেশের সব গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। নারীর

অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং রাজনৈতিক সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে। যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করেন, যারা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সব অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

ক্ষমতার রাজনীতির আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে থেকে ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধ যারা সংগঠিত করে তাদের সাধারণ শাস্তির আওতায় আনা যায় না। ধর্ষণ এবং হত্যার মতো গুরুতর অপরাধ করে কেউ যেন রেহাই না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। বিচারিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা কার্যত বিচারহীনতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিকমতো ডাক্তারি পরীক্ষা না হওয়া, পারিবারিক ও সামাজিক মনোভঙ্গি, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এবং সাক্ষ্য আইনের জটিলতার কারণেও নির্যাতনের শিকার নারী ন্যায়বিচার বঞ্চিত হয়ে থাকেন। শুধু কঠোর শাস্তির আইন করলেই হবে না, দ্রুততম সময়ে বিচার এবং রায় কার্যকর করার নজির স্থাপন করতে হবে। অপরাধ করে কেউ পার পাবে না – এটা কেবল মুখে বললে হবে না, সবার কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নারীর প্রতি অধিক সংবেদনশীল হতে হবে। নারী নির্যাতন বন্ধে সরকারের সদিচ্ছার বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা পুরুষদের হতে হবে মানবিক। নারীকে ভোগের বস্তু ভাবার চিরায়ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর পোশাক, নারীর চালচলনকে যারা নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ বলে মনে করেন তারা আসলে ভেতরে ভেতরে একটি নির্যাতক মানসিকতাই পোষণ করেন। কোনো কুযুক্তি যেন নারীর অধিকার ও মর্যাদা হরণের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সরকারের।



মনজু আরা বেগম *

নারী উন্নয়ন বনাম নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে এ দেশের নারী সমাজও। বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে বিবেচনা করছে 'এশিয়ান টাইগার' হিসেবে। একসময় দক্ষিণ কোরিয়াকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এখন সে স্থান দখল করেছে বাংলাদেশ। নারীরা আজ তাদের অভিজ্ঞতায়, দক্ষতায়, মেধায় মননে এগিয়ে যাচ্ছেন। চার দেয়ালের বন্দিজীবন থেকে বেড়িয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। দেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তিরূপে নারীরা ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কৃষি, শিল্প, সেবা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ এমন কোনো খাত নেই যেখানে নারীরা এগিয়ে আসছেননা বা যেখানে তাদের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন না। দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যতগুলো খাত রয়েছে তার প্রায় সব ক'টিতেই বিশেষ করে কৃষি, শিল্পসহ পোশাক শিল্পখাতে নারীর অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশে রপ্তানি খাতের ৮০ শতাংশই আসে পোশাক শিল্পখাত থেকে।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নারীরা বিভিন্নক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নারীরা সমানভাবে অবদান রাখছে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়নে নারীরাও সমভাবে অংশীদার। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যতগুলো খাত আছে তার প্রায় সবগুলোতে নারীদের অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প সারা বিশ্বে স্বীকৃত। ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার, কাবাডি, ভরোত্তোলন থেকে শুরু করে পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত জয় করছে নারীরা।

২০১৮ সালে ২০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ছিল সমান সমান। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৮ লাখ ৫৮ হাজারের

*** লেখক ও সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বিসিক ও মহাপরিচালক, এফসিটিবি**

বেশি। ছাত্র ৪ লাখ ৩৫ হাজার এবং ছাত্রী ৪ লাখ ২৪ হাজার। অর্থাৎ ছাত্র ও ছাত্রী প্রায় সমান সমান। এ পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশের নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা-সহ কিছু কিছু পেশায় পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছেন নারীরা। শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে নারী নেতৃত্বের জয়জয়কার। ২০১৮ সালে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই নারী নেতৃত্বের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রেকর্ডসংখ্যক নারীরা এখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন, যা বৈশ্বিক রাজনীতির চেহারা পাল্টে দিচ্ছে। স্পেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের পর দেশটির মন্ত্রিসভায় পুরুষের চেয়ে বেশি নারীকে মনোনীত করা হয়েছে। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, নারীরা আর চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নেই।

মৌলভীবাজারের কূলাউড়া উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল গড়গাঁও গ্রামের দিনমজুর মহরম আলী ও হাওয়া বেগমের মেয়ে সুলতানপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মনি বেগম জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে বক্তব্য রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বিশাল গৌরবের বিষয় বটে।

উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের কাছাকাছি নারীর অবদান, অথচ এখনও সমাজে ও রাষ্ট্রেনারীরাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এরপরও বলতে হয় যে দেশের নারী প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের প্রধান নারী, স্পিকার নারী, সে দেশের নারীদের একবিংশ শতাব্দীতে এসেও অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে, অবমূল্যায়িত হতে হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

নারীরা প্রতিদিন বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। নারীরা পরগাছা হিসেবে এখনও সমাজে পরিচিত। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার তেমন নেই বললেই চলে। ফলে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে আছে। নারীরা রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, কর্মক্ষেত্র, সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট এমনকি নিজের যে ঘর সেখানেও তারা নিরাপদে নেই। তাহলে কোথায় তারা নিরাপদ? যে দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী, যে দেশে খোদ প্রধানমন্ত্রী টানা তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রিত্ব করছেন, সংসদে প্রধান স্পিকার নারী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সচিব, পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদে নারীরা অধিষ্ঠিত রয়েছেন। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও নারীরা এগিয়ে এসেছেন। সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। তারপরও দেশে নারীরা কোথাও নিরাপদে নেই কেন? এ প্রশ্ন এ দেশের নারী সমাজের। নারীরা সমাজেএত এগিয়ে থাকার পরওনারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। দেশে সামগ্রিকভাবে শিশুমৃত্যু ও বিবাহ

বিচ্ছেদের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্টাটিসটিকস-২০২২ এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানাযায়, ২০২১ সালে দেশে এক বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২২ জন, ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৫ জন। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু হার ছিল হাজারে ২৮ জন, ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩১ জন। একইভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের হার ২০২১ সালে ছিল হাজারে ০.৭জন, ২০২২ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১.৪ জন। এর একটা বড় কারণ হিসেবে বলা যায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং পারিবারিক আচরণ। নারীকে এখনও দেখা হয় ঘর সংসারের ভার বহনকারী একজন মানুষ হিসেবে। সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার মতো মানসিকতা এখনও আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গড়ে ওঠেনি। নারীরা সন্তান উৎপাদন ও গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত থাকার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে এ রকম মানসিকতা অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি পোষণ করেন। যার কারণে সমাজে নারী নির্যাতন বাড়ছে বৈ কমছে না।

'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯৩৬ জন নারী। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৭ জন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, ২০২২ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭১৫ জন নারী, গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২২৬ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৮ জনকে, অ্যাসিডদগ্ধ হয়েছেন ২২ জন। সবমিলিয়ে ২০২২ সালে সারাদেশে ৩ হাজার ৪৯৫ জন নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

একজন মানুষের সবচাইতে নিরাপদ আশ্রয় হলো তার নিজের ঘর বা বাড়ি এবং তার পরিবার। সারাদিনের কর্মক্লান্তি শেষে মুনষ নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরে একটু শান্তির জন্য। সুখ-দুঃখ তার পরিবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করার জন্য। কিন্ত সে ঘরেও নারী নিরাপদ নয়। নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপ অনুযায়ী দেশে বিবাহিত নারীদের ৮০ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন। সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন স্বামী দ্বারা।

দুঃখের বিষয় হলো, বাংলাদেশে আইন আছে, কিন্তু তার যথাযথ প্রয়োগ নেই। আইনের প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের অভাবে অপরাধীরা আরও বেশি অপরাধপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কর্মজীবী নারীর জন্য আবাসন, অনিরাপদ রাস্তাঘাট, প্রতিকূল কর্মপরিবেশ, অনিরাপদ ও অপর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, সামগ্রিকভাবে নারীশিক্ষার অভাব, অপুষ্টি, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন।

নারীর অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার পেছনে যে সকল বাধা কাজ করছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে মানবাধিকার সংস্থাগুলোসহ সরকারের তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এছাড়াও নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের জন্য যে সব আইন ও নীতিমালা আছে সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। প্রচার ও গণমাধ্যমগুলো এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি অপরাধের শাস্তিগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ করা না গেলে আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে,সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে পরিবার ও সমাজ। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে দল-মত নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।



মনিকা বিশ্বাস *

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: শিশুদের অধিকারের ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশেও এটি অন্যতম আলোচিত সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের কারণে বাংলাদেশকে এক্ষেত্রে একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

চলতি বছরের (২০২৩) জানুয়ারি মাসে, বাংলাদেশের আটটি জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, তিনজন শিশুর মধ্যে একজন শিশু চরম আবহাওয়া, বন্যা, নদীভাঙন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু সংকটের কারণে সৃষ্ট অন্যান্য পরিবেশগত অভিঘাতের শিকার। তারা পুষ্টি ও খাদ্য ঘাটতি এবং বিভিন্ন শারীরিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে বাল্যবিবাহর শিকার হচ্ছে। এদের মধ্যে কন্যাশিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে। তাই, জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রচেষ্টায় শিশুদের জড়িত করা, তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, একটি টেকসই ও স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুরা, বিশেষ করে কন্যাশিশুরা, তারা শূন্য কার্বন নিঃসরণকারী হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তন তাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। জলবায়ু সংকটের ফলে তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, খাদ্য, নিরাপত্তা ও বাল্যবিবাহ সংকটের মতো নানা প্রকার ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের কোমলমতি জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। জলবায়ু সংকট শিশু অধিকারের জন্যও একটি বড় সংকট। এই জলবায়ু সংকটের শিকার হওয়া থেকে আমাদের শিশুদেরকে রক্ষা করতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে।

জীবাশ্ম জ্বালানি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। তাই যেসকল শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছে তা

*** ব্যবস্থাপক, চাইল্ড স্পনসরশিপ বিভাগ, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ**

রোধে দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সহায়তা বন্ধে আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, কৃষিবিদ্যাকে কেন্দ্র করে টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের জন্য আমাদের অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। এই অনুশীলনগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, জীবিকা রক্ষার জন্য এবং প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে শিশুদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকূলীয়ক্ষয় শিশুদের জীবনে বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। সর্বনিম্ন কার্বন সৃষ্টিকারী শিশুরা হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশে প্রায় প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজন শিশু এবং সারা বিশ্বে ২০ মিলিয়নের চেয়ে বেশি শিশু জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবের শিকার হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম সারিতে রয়েছে, যেখানে শিশুদের ৪১ শতাংশ হলো ১৮ বছরের কম। আর এর মধ্যে কন্যাশিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুরা যে সকল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তারমধ্যে অন্যতম হলো:

✦ বন্যার কারণে স্কুলগুলো দীর্ঘমেয়াদে বন্ধ ছিল;

✦ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে;

✦ বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেক দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়, যা শিশুদের পড়াশোনার সময়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে;

✦ শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি।

শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

✦ লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে ডায়রিয়া, জন্ডিস এবং অন্যান্য পানিবাহিত রোগের বৃদ্ধি;

✦ বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে;

✦ প্রচণ্ড গরম ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন অ্যালার্জি ও চর্মরোগে শিশুরা ভুগছে;

✦ ঘন ঘন বন্যা ও অমৌসুমী বৃষ্টির কারণে পানিবাহিত রোগের বৃদ্ধি;

✦ বায়ু দূষণের কারণে অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্টজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিশুরা ভুগছে।

✦ **অপুষ্টি:** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে, যা মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। ইউনিসেফের মতে, বাংলাদেশ পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৩৬ শতাংশ শিশু অপুষ্টির কারণে

এবং ৩৩ শতাংশ শিশু কম ওজনের সমস্যায় ভুগছে। জলবায়ু পরিবর্তন এই সমস্যাগুলোকে আরও বাড়িয়েতুলছে।

✦ **জলবাহিত রোগ:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ধিত বন্যা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং জল দূষণের ফলে মেয়েদের মধ্যে ডায়রিয়ার মতো জলবাহিত রোগের প্রকোপ বেশি হতে পারে।

✦ **প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা:** ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কন্যাশিশুরা প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে বেড়ে ওঠছে, যা তাদের ভবিষ্যৎকে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

বাল্যবিবাহ: জলবায়ু সংকট ও পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি করছে। কারণ পরিবারগুলো বিবাহকে তাদের অর্থনৈতিক বোঝা কমানোর উপায় হিসেবে মনে করছে। এর ফলে মেয়েরা স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, যা তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎকে চরম ঝুঁকির সম্মুখীন করছে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা: জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপর্যয়ের সময় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানচ্যুতি এবং অতিরিক্ত ভিড় মেয়েদের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকির কথা আমরা প্রায়শই শুনতে পাই। গবেষণায় দেখা যায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা বেড়ে যায়।

কৃষি: জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিকে প্রভাবিত করে, যা বাংলাদেশের মানুষের জীবিকার একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। শস্যের ফলন হ্রাস এবং আবহাওয়ার ধরনগুলো কৃষক পরিবারের আয়ের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে শিশুশ্রম বৃদ্ধি এবং মেয়েদেরকে বাল্যবিবাহের দিকে পরিচালিত করে।

অভিবাসন: জলবায়ু-প্ররোচিত স্থানচ্যুতি গ্রামথেকে শহুরে অভিবাসনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাস্তুচ্যুত পরিবারের মেয়েরা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কারণে শহর এলাকায় শোষণমূলক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশুদ্ধ জল এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন: সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততা জলের উৎসকে দুষিত করতে পারে, যা পরিষ্কার জল এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন অ্যাক্সেকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। মেয়েরা প্রায়ই জল আনার দায়িত্বে থাকে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই কাজটি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এই পরিবর্তনের প্রধান দুটি প্রভাব নিম্নরূপ:

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি বেড়েছে

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন, তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, বৃষ্টিপাত অধিকতর হওয়া, সমুদ্রের পানির স্তর বেড়ে যাওয়া, সাইক্লোনের ঝুঁকি ইত্যাদি। এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কন্যাশিশুদেরকে অতিরিক্ত ঝুঁকি সামলাতে হচ্ছে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ এবং অনিশ্চিয়তা তৈরি হচ্ছে।

জীবনে পরিবর্তন আনছে

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কন্যাশিশুরা তাদের জীবনে পরিবর্তন অনুভব করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্তী বন্যা এবং কৃষি সংকটের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে, যা কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের কন্যাশিশুরা এই পরিবর্তনের মধ্যেই বেড়ে ওঠছে এবং এরফলে প্রতিদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎকে আরও ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

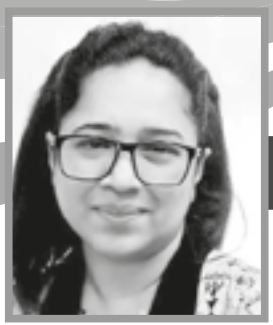
এই সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষা, সহযোগিতা, ও সার্বিক সমর্থন দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কন্যাশিশুদের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে প্রকৃতি সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত আবাসিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং জলবায়ু সংকট রোধে আমাদের প্রত্যাশা এবং বাস্তবতার সঙ্গে ক্রমাগত তারতম্য দিন দিন বেড়েই চলছে।

প্রত্যাশা	বাস্তবতা
জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমাগত হ্রাস করা	উন্নতির নামে সারাবিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানের চেয়ে জলবায়ু সংকট সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে
টেকসই, জলবায়ু সহনশীল কৃষিব্যবস্থা বাড়ানো এবং শিল্প কৃষি অনুশীলন কমানো	জলবায়ু সংকট বৃদ্ধির বড়কারণ হলো জীবাশ্ম জ্বালানি এবং শিল্প কৃষি ব্যবহার বৃদ্ধি, যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে
জলবায়ু সংকট সমাধানের জন্য আরও তহবিল এবং সহায়তা বৃদ্ধি করা	বিনিয়োগকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো ক্রমাগতভাবে জীবাশ্ম জ্বালনি উৎপাদনকারী কোম্পানি এবং শিল্প কৃষিকে অর্থায়ন বৃদ্ধি করাই চলছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার জন্য নীতি, ব্যবস্থা ও সমাধানগুলো নির্ধারণ করা	জলবায়ু সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সমাধানগুলো উদ্বেগজনকভাবে স্বল্প অর্থায়নে হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কন্যাশিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করছে। তার মধ্যে আবার জলবায়ুর পরিবর্তন আরেকটি বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্রমাগত দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কন্যাশিশুরা নানামুখী ঝুঁকির মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের কন্যাশিশুদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে,যা কন্যাশিশুদের জীবনের ঝুঁকির মাত্রাকে বর্তমান অবস্থার চেয়েও আরও বেশি কঠিন করে তুলছে। ফলে কন্যাশিশুরা আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে প্রভাবিত হচ্ছে ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝে বেড়ে ওঠছে, যা কন্যাশিশুদের বিদ্যমান দুর্বলতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

এই সমস্যাগুলোর সমাধানে সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং নারী ও কন্যাশিশুদের সমৃদ্ধি, সুরক্ষা ও সামাজিক সমর্থন প্রদান করতে পারে। এটি মেয়েদের উন্নতি এবং সমাজে তাদের অবস্থান তৈরির একটি প্রয়াস হতে পারে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারকদের দ্বারা নতুন আইন ও নীতির বিকাশ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং তাদের কার্যকর প্রয়োগের নিশ্চয়তা দিতে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যেন জলবায়ু পুরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনও প্রশমনের সঙ্গে জড়িত ব্যবসা এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের ওপর উচ্চ করারোপ করতে হবে। সবপ্রাসঙ্গিকখাতে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনের মাত্রা কমাতে এবং বন্ধ করতে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন বন্ধ করা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনে ব্যাংকিং বিনিয়োগ বন্ধ করা জরুরি।



মাসুমা বিল্লাহ*

প্রযুক্তির বিভাজন কিশোরীর জন্য বৈষম্য

প্রযুক্তির এই যুগে কিশোরী মেয়েটি কি প্রযুক্তির সেবা পাচ্ছে? নাকি প্রযুক্তির কাছাকাছি যেয়ে সে আরও বেশি অনিরাপত্তার জালে আটকে যাচ্ছে? প্রযুক্তি কি নিরাপত্তাহীনতাকে উস্কে দিচ্ছে? তাহলে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে কী করা উচিত? নাকি নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কিশোরী মেয়েটিকে প্রযুক্তির ছোঁয়া থেকে দূরে রাখা হচ্ছে?

যুগটা প্রযুক্তির। প্রযুক্তি মানুষের সেবায় কতটা কাজে আসছে, সেটিই আধুনিক উন্নয়ন আলোচনার আলোকপাত। প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা মানে যুগের ডাকে পিছিয়ে থাকা।

ডিজিটাল জেন্ডার গ্যাপ বা ডিজিটাল লিঙ্গ ব্যবধান– এটি আজকাল আলোচনায় উঠে আসছে জোরালোভাবে। আর এই আলোচনার একটা মূল বিষয় হচ্ছে 'ডিজিটাল বিভাজন'। ডিজিটাল বিভাজন বা প্রযুক্তিগত ব্যবধান হলো, প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের সেবা নেওয়ার সক্ষমতা যাঁদের রয়েছে এবং নেই, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য।

পরিসংখ্যান বলে, প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারে পুরুষের তুলনায় নারীর প্রবেশগম্যতা কম। এ ব্যবধান বাংলাদেশের মতো দেশে আশঙ্কাজনকভাবে বেশি হবে। কারণ এখানে নারীর সম্পদের ওপরে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ দুটিই পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

ইন্টারনেট-সহ স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীর ভাগ বিশ্বব্যাপী কম। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নারীদের তুলনায় পুরুষের অনলাইনে থাকার সম্ভাবনা ২১ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ ব্যবধান ৫২ শতাংশের বেশি।

*** জনসংখ্যাবিদ ও প্রোগ্রাম হেড, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি প্রোগ্রাম, ব্র্যাক**

আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) বলছে, বিশ্বের ৫০ শতাংশের বেশি নারী থাকছেন অফলাইনে। অন্য এক পরিসংখ্যান বলছে, উন্নয়নশীল দেশে ৯৯৩ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর কোনো নিজস্ব মোবাইল ফোন নেই। মোবাইল মালিকানায় লিঙ্গ ব্যবধান দক্ষিণ এশিয়ায় ২৩ শতাংশ, সাব-সাহারান আফ্রিকায় ১৩ শতাংশ। এসব এলাকায় নারীরা সাধারণত পুরুষদের কাছ থেকে ধার করে মোবাইল ব্যবহার করেন। প্রায়ই একটি পরিবারে একটি ফোন থাকলে তার মালিকানা থাকে পরিবারের পুরুষ সদস্যটির কাছে। নারীদের স্মার্টফোনের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা পুরুষের তুলনায় ২০ শতাংশ কম।

ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজনকে তিনটি ভাগে দেখা যেতে পারে: এক. ডিজিটাল প্রযুক্তিতে অ্যাকসেস বা প্রবেশগম্যতা, ব্যবহার ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তি; দুই. ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ; তিন. দৃশ্যমান নেতৃত্বে নারীদের অগ্রগতি ও ডিজিটাল সেক্টরে সিদ্ধান্তগ্রহণের ভূমিকা।

যেখানে পুরুষতন্ত্র বেপরোয়া, সেখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রযুক্তিগত দিকগুলোর সঙ্গে পুরুষ বেশি সম্পৃক্ত থাকেন। অন্যদিকে সামাজিকভাবে প্রচলিত জেন্ডার নর্ম নারীকে অপ্রযুক্তিগত গৃহস্থালি ভূমিকায় নিযুক্ত রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য পায়। ব্যয়বহুল হ্যান্ডসেট ও ডাটা শুল্ক, সামাজিক নিয়ম এবং সর্বোপরি ডিজিটাল নিরাপত্তাহীনতা নারী ও মেয়েদের অনলাইন সেবা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে।

আমরা সবাই যেহেতু জানি, অনলাইনে যুক্ত থাকা, ইন্টারনেট সুবিধা থাকা ইত্যাদি বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে কোভিড-পরবর্তীকালে শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এবং সংগত কারণেই নারীরা পিছিয়ে যাচ্ছেন পুরুষের তুলনায় এবং অপচয় হচ্ছে নারীর সম্ভাবনার। অন্যদিকে নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বা বাড়ির বাইরে চাকরি বজায় রাখতে পারলেই কেবল তাঁর জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানেও নারী পুরুষের চেয়ে অনগ্রসর।

সাইবার হয়রানি ডিজিটাল স্পেসে জেন্ডার গ্যাপকে উৎসাহিত করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। ডিএমপি সাইবার অপরাধ শাখার তথ্যমতে, দেশের ৮০ শতাংশ সাইবার হয়রানির শিকার নারী। সাইবার হয়রানি কমাতে না পারলে ডিজিটাল লিঙ্গ ব্যবধান কমানো যাবে না। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নতুন ধাপে বাংলাদেশ প্রবেশ করবে অর্ধেক জনশক্তি নিয়ে। সুতরাং সাইবার হয়রানি বন্ধ করা ও ডিজিটাল জেন্ডার গ্যাপ কমিয়ে আনা সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে একটি হওয়া উচিত। যদি ডিজিটাল লিঙ্গ ব্যবধান কমানো না যায়, তবে প্রযুক্তি সাফল্যের পরিবর্তে সামাজিক ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

আমাদের বিপুল সংখ্যক কিশোরীকে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার আড়ালে রেখে সম্ভাবনার আগামীকে ধরা যাবে না, তা পিছলে যাবে নিজেদের

অজান্তেই। সমতার পৃথিবী বিনির্মাণ করবে প্রযুক্তি– এটিই প্রযুক্তির কাছে মানবসভ্যতার কামনা। জেন্ডার সমতার জন্য সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হোক সর্বোত্তম উপায়ে। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো প্রযুক্তির প্রাপ্তিতে এবং ব্যবহারে নারী নিজেকে প্রমাণ করেই এগিয়ে যাবে, যেমন করে প্রমাণিত যে নারী আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সকল দ্বার সকল কিশোরীর জন্য থাকুক সমানভাবে উন্মুক্ত।



মো. তানজিমুল ইসলাম*

তবুও নারীরা আমাদের প্রেরণা যোগায়!

আধুনিক বিশ্বের উন্নয়ন জগতে অতি সাধারণ মানুষের কাছে 'জেন্ডার' মানে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্যাতন টাইপের একটি বিষয়। আশির দশকের শেষের দিকে বিষয়টি প্রায় এরকমই ছিল। কিন্তু কালক্রমে অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে এ ধারণার অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও জনমনে ভ্রান্ত ধারণাটি যেন আজো অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরাই দায়ী। আমরা জানি, উন্নয়ন জগতে জেন্ডার হলো: নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমতায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, 'জেন্ডার' একটি সামাজিক লিঙ্গ। প্রয়োজনের তাগিদে একে পরিবর্তন করা যায় বা করতে হয়। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষযখন সমানতালে কাজ করছে, প্রয়োজনের খাতিরে প্রাচীন চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের কাজকে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে এবং সর্বোপরি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন করে নিচ্ছে, জেন্ডারের উদ্দেশ্যও ঠিক তখনই সফল হচ্ছে।

খুব সংক্ষেপে/সাধারণভাবে বলা যায়: সময়ের প্রয়োজনে পরিস্থিতির বিবেচনায় কৌশলগত কারণে ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর প্রতি পুরুষ; পক্ষান্তরে পুরুষের প্রতি নারীর যে সহযোগিতা-সহমর্মিতা ও কাজ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়ার যে উদ্যোগ, তা-ই মূলত উন্নয়ন জগতে জেন্ডার হিসেবে অভিহিত।

যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রায় পুরো বিশ্বেই নারীরা অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে খানিকটা পশ্চাৎপদ (পিছিয়ে পড়া) অবস্থানে ছিল, তাই উন্নয়ন জগতের মানুষদের তথা দাতাগোষ্ঠীদের চিন্তাটা অনেকটা নারীকে কেন্দ্র করেই নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে।

*** কো-অর্ডিনেটর, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ**

বাংলাদেশ নামক এ ঐতিহাসিক দেশটি স্বাধীনতার পরে অর্ধ-শতাব্দী পার করেছে। সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ কর্মসূচি/পদক্ষেপের ফলে নারীরা আজ প্রায় সর্ব দিক থেকেই এগিয়েছে বা এগিয়ে চলেছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থনীতি-অধিকার-মত প্রকাশের স্বাধীনতা, এমনকি স্বনির্ভরতায় নারীরা দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছে, যা দু'দশক আগেও কল্পনা করা যেত না। আর এক্ষেত্রে উন্নয়ন জগতের মানুষদের নিরলস প্রচেষ্টা এক অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। জেন্ডার সহিংসতার শিকার গোষ্ঠীদের এগিয়ে নেওয়ার জন্যে ইতিমধ্যে ইতিবাচক কর্মসূচি নানা মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। যদিও এখনও অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে, তথাপি কোথায় যেন এক অদৃশ্য কারণে আবার প্রত্যাশিত ফলাফলও মিলছে না। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ, সমাবেশ, গোলটেবিল বৈঠক, মানববন্ধন কর্মসূচি, ইত্যাদি প্রচলিত। বছরের পরে বছর চলে যায়, সময়ের আপন নিয়মে নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হতে থাকে; একটি বিশেষ শ্রেণি সোচ্চার হলেও অন্য একটি বিশেষ শক্তিধর গোষ্ঠী বহাল তবিয়তে তাদের পৌরুষ আচরণ প্রতিষ্ঠা করতে থাকে আধুনিক কায়দায়। শুধু কাগজে-কলমেই নয়, বরং সারাবিশ্বের মানুষের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে একটি বিশ্বাস: নারীরা অবহেলিত-নির্যাতিত-বঞ্চিত, ইত্যাদি!

বাস্তবতা যাই হোক না কেন, শুধু স্বীকৃতি না দেওয়ার করণে অথবা নারীদেকে মানুষ হিসেবে পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন না করার কারণেই এই চিত্রটি স্থায়ীভাবে আটকে আছে। নারীর উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে এই জ্যামটি তাদের গতিশীলতাকে কেবল ব্যাহতই করছে না, বরং পিছিয়ে দিচ্ছে পুরো একটি জাতিকে।

নারীর কেন এই পিছিয়ে পড়া?

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন মেয়েকে তার নারী হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার চলাফেরা, মতামত প্রকাশ, এমনকি যাবতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছার গাইডলাইন নির্ধারণ করে দেয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী নির্যাতনের শিকার হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী জনবলের মধ্যে বিশেষ করে সেবক/সেবিকাদের মধ্যে আশি শতাংশেরও বেশি নারী। এই নারীরাই আবার আজকের যে কোনো মহা সংকটে নিজেকে নিয়োজিত করে থাকে। অথচ, তাদের কোনো স্বীকৃতি মেলে না, কিছুতেই না!

উন্নয়ন জগতে নারী উন্নয়নের কথা বলার পরই জনৈক আলোচক যখন নিজের স্ত্রীর প্রতি শারীরিক নির্যাতন তথা পারিবারিক সহিংসতার অনুঘটক হন, তখন বিষয়টি বড্ড সাংঘর্ষিকই বটে! আমরা কি নারীর প্রতি এতটুকু মানবিক হতে পেরেছি?

অথবা মানুষ হিসেবে নারীকে স্বীকৃতি দিতে কিসে এত আপত্তি আমাদের?

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদের ভিত্তিতে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' কর্তৃক প্রস্তুত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯৩৬ জন নারী। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৭ জন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, ২০২২ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭১৫ জন নারী, গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২২৬ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৮ জনকে, অ্যাসিডদগ্ধ হয়েছেন ২২ জন। সবমিলিয়ে ২০২২ সালে সারাদেশে ৩ হাজার ৪৯৫ জন নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

পক্ষান্তরে, খবরে প্রকাশিত হয়নি, এমন ঘটনার সংখ্যাটি কেবল অনুমান করে নিলেই বোঝা যায়! আশ্চর্য ব্যাপার, অধিকাংশ ধর্ষণ তথা নারী নির্যাতনমূলক নানাবিধ ঘটনাগুলো ঘটছে মূলত নিকটাত্মীয় ও তাদের পরিচিত কারো দ্বারাই! অর্থাৎ এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের মেয়েরা তথা নারীরা কোথাও তেমন একটা নিরাপদ নয় বললেই চলে! আপাতদৃষ্টিতে যে কোনো অবকাশে ঘরে থাকার সুযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে সন্তানেরা মা-বাবাকে পেয়ে খুশি হওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবতা হলো, পরিবার ও সমাজে এমনকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দ্বারাই নানা রকম সহিংসতার শিকার হয়ে যায় অবাধে! বিশেষ করে এমন ঘটনাগুলো এমন ব্যক্তির দ্বারাই ঘটে যারা সভ্যতার চাষাবাদ করে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেই! খুব সম্প্রতি কোভিড-১৯ এর ফলে দৈনন্দিন ব্যস্ততা ছেড়ে লকডাউনের কারণে দাম্পত্য জীবনে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার ফলে পবিবারে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নতি ঘটবে বলে যেটি আমরা ধারণা করেছিলাম, সেটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে! বাস্তবতা এর ঠিক উল্টো! বৈশ্বিক এই দুরাবস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবার ফলে পুরুষেরা যখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই নারীর প্রতি অহেতুক অত্যাচার করেপুরুষ তার পৌরুষ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে! সংক্ষুব্ধ নারীর ক্ষেত্রে তার শাশুড়ি কিংবা ননদের দিক থেকেও বাড়তি কোনো সহায়তা পরিলক্ষিত হয় না এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে! তাহলে কোথায় গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবে নারী? উপরন্তু, কঠোর এই পুরুষতান্ত্রিকতার কু-প্রভাবে ও ধর্মীয় অনুশাসনের যাঁতাকলে নারীদের পিষ্ট করা হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে! অথচ, প্রতিটি ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার আহ্বান করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধেবিশেষ কর্মসূচি পালন কি যথেষ্ট?

যেহেতু সারা বিশ্বেই নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে বা হয়েই আসছে, তাই সারাবিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা নারীর প্রতি সহিংতা প্রতিরোধে তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে জাতিসংঘের

মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, 'যতদিন নারীরা নির্ভয়েও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে না, এমনকি যতদিন নারীদের নিরাপত্তা ও সহিংসতা নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হবে, ততদিন পুরো বিশ্ব নারীদের সমান অধিকারের ব্যাপারে অহঙ্কার করতে পারবে না।'

সময়ের প্রয়োজনে 'ইউনাইট ক্যাম্পেইন' নামক বিশ্বব্যাপী একটি বিশেষ প্রচারণা চালু হয়। যার মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে আহ্বান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেককে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কমলা রঙকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সব দেশের নারী, যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, হচ্ছেন কিংবা বেঁচে ফিরে এসেছেন, তাদের জন্য অথবা তাদের হয়ে কথা বলার জন্য এই বিশেষ প্ল্যাটফর্ম! পরবর্তীকালে আরো নিত্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও নারীর প্রতি সহিংসতার হার কমেনি এতটুকু!

তাহলে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কি?

যদিও নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবিলা কোন সহজ কাজ নয়; এজন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচি হাতে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা প্রায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাই নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাশাপাশি দৈনন্দিন কর্মসূচিতে, পরিবার-সমাজতথা রাষ্ট্রে নারীকে তার অবদান রাখার সুযোগ করেদিতে হবে। তাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। শক্তিমত্তার বিবেচনায় নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তরুণ, যুবক, পৌঢ় তথা পুরুষদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মস্থল, শহর, বন্দর, যানবাহন, এমনকি বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর একজন নারীর প্রয়োজনীয় আইনি ও চিকিৎসা সহায়তার সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। যৌন সহিংসতার মামলার কার্যক্রমে অবহেলা রুখতে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট বিভাগকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। নারীরা যে কোনো ধরনের শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ও যৌন হয়রানির শিকার হলে এবং অল্প বয়সী মেয়ে ও শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে ও প্রকাশ্য স্থানে হেনস্তার শিকার হলে তা দমনেতাৎক্ষণিক জোরালো ব্যবস্থা নিতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে নারীকে তার সঠিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা জাগ্রত রাখতে হবে। প্রচলিত আবদ্ধ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। বৈষম্যের মূল কারণ বের করে সমাধান বের করতে হবে এবং মেয়েদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হবে।

‘পুরুষ নারীর প্রতিপক্ষ নয়, নারীও পুরুষের প্রতিপক্ষ নয়’– এটি সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে। সমাজে নারী-পুরুষের যে ন্যায্য অধিকার ও গুরুত্ব রয়েছে; উভয়ে মিলে যে অভিন্ন সত্তা, এই মানবিকতাবোধটুকু সমাজ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে নারীর প্রতি বৈষম্য চলতেই থাকবে। আর এই কাজগুলো শুরু করতে হবে একদম গোড়া থেকে, অর্থাৎ পরিবার থেকে। তাই আসুন, সবাই মিলে সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। নিজ নিজ জায়গা থেকে সোচ্চার হয়ে প্রতিরোধ করি নারী নির্যাতন। উপরোক্ত করণীয়সমূহ নিতান্তই মানবজাতির। নারীজাতিকে মানুষ হিসেবে যোগ্য সম্মান প্রদান করার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের সকলের, বিশেষ করে পুরুষ জাতির!

সার্বিক বিবেচনায় জেন্ডার সহিংসতা নিয়ে অনেক আলোচনা/সমালোচনা হয়েছে, জনমনে সচেতনতাও বেড়েছে। তবে ইদানিংকালে একটি বিষয় নতুন করে চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছে, তা হলো নারী ও শিশু ধর্ষণ! নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেকে অকপটে তাদের ধর্ষিত হওয়ার গল্প শোনালেও বেশিরভাগ মানুষই তা আমলে নিতে চান না। বিভিন্ন আলোচনায় ফিসফিসিয়ে বা কুর্নিশ করে অনেককেই বলতে শোনা যায়, ‘সময় এসেছে ধর্ষণ বিরোধী আলোচনার বিষয়টি আলোকপাত করবার!’ অনেক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটলেও নিজের আয়ের কর্তৃত্ব যেন অধরাই রয়ে যায় নিদেনপক্ষে শিক্ষিত-সভ্য-স্বচ্ছল পরিবারের নারীদেরও! এটা নতুন করে উন্নয়নকামী মানুষদের ভাবিয়ে তুলবে! জেলা জজ কোর্টে নারী নির্যাতনমূলক মামলার অধিকাংশকেই যখন মিথ্যা, বানোয়াট আর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে ধামাচাপা দেয়া হয়, তখন বিষয়টি নতুনভাবে নাড়া দেয়! এক্ষেত্রে নারীরা বড্ড অসহায় আর লজ্জার চাদর গায়ে জড়িয়ে দিনাতিপাতকরে। লোকচক্ষুর অন্তরালে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হলেও নারীরা কিছু বলে না; বলার পরিবেশ নেই এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে! তাই কিল খেয়ে কিল হজম করে চলেছে অনেক শিক্ষিত-স্বচ্ছল নারী! এমন না বলা গল্পগুলো যেদিন একসঙ্গে বিস্ফোরিত হবে, সেদিন হয়তো লজ্জায় কুটি কুটি হাসবে নতজানু পুরুষ সমাজ! প্রথাগত/প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ‘পুরুষ’ নামক প্রাণীটির জন্মই হয় যেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যই! আর এসব লালন-পালনের দায়িত্ব নারীর– এ যেন অলিখিত সংবিধান!

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, লোকলজ্জার ভয়ে নারী জাতি আজ বড্ড একা, যা তিনি কোনো নিকট বন্ধুকেও জানাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। উপরন্তু নারী নির্যাতনের প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন! তাই তো বহাল তবিয়তে পার পেয়ে যাচ্ছে অনেক নারী নির্যাতক! নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বা নারীর ক্ষমতায়নের ফলে নারীদের বিভিন্ন ঐক্যজোট রয়েছে, টক শো’তে আলোচনার ঝড় ওঠে, অথচ ঠিক সেই মুহূর্তেই নির্যাতনের শিকার নারীরা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে আড়ালে আবডালে! এহেন অনিয়ম-অন্যায়-অনাচার-বৈষম্য দূরীকরণে সকলের ঐকমত্য ও

সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রিয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; আসুন, জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-বর্ণ-নির্বিশেষে জেন্ডার সহিংসতা নির্মূল করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যেকে জেন্ডার সংবেদনশীল হই.....! পরিস্থিতির বিবেচনায় ও সময়ের প্রয়োজনে, সকল জঞ্জাল সরিয়ে এমনি করেই নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে উন্নয়নের স্রোতধারায়! নারীর অনন্য অবদান ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই, নারী জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান, সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জাতির জাগ্রত বিবেক হিসেবে তোমায় জেগে ওঠতে হবে নারী! একইসঙ্গে পুরুষ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নারীর চলার পথকে সুগম করে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব! পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তবুও নারীরা আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে প্রেরণা যোগায়!



মৌলি আজাদ*

কন্যাশিশু বিকাশের দায়িত্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের

কন্যাশিশুর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে লিখতে গিয়ে নিজের মেয়েবেলার কথা মনে পড়ে গেল। কন্যাশিশুদের মেয়েবেলা মোটেই আনন্দদায়ক থাকে না। উচ্চবিত্ত/মধ্যবিত্ত/নিম্নবিত্ত সকল পরিবারেই কন্যাশিশুরা অনেক বিষয় নিয়ে অস্বস্তিতে থাকে। আমাদের সমাজব্যবস্থা এমন যে কন্যাশিশু নিজে যেমন নিজের কথা বলতে পারে না, পরিবারও বেশিরভাগ কন্যাশিশুকে সাপোর্ট করে না। ফলে আমাদের দেশে কন্যাশিশুরা নানা রকম ভুল ধারণা ও মনে চাপা কষ্ট নিয়ে বেড়ে ওঠে। তবে সময় পাল্টেছে। এখন কন্যাশিশুদের সমস্যাও তাদের অধিকার নিয়ে সবাই কথা বলছে। এর ফলে আমাদের প্রজন্মের কন্যারা মেয়েবেলা ভালোভাবে অতিবাহিত না করলেও আশা করা যায় পরবর্তী প্রজন্মের কন্যারা সুন্দর ও সুস্থ শৈশব কাটাতে পারবে।

আমাদের সমাজে কন্যাশিশুদের প্রথম সমস্যা হলো: তাদের কথা বলার কোনো স্পেস নেই। বেশিরভাগ বাসায় কন্যাশিশুরা মা-বাবাকে তাদের সমস্যার কথা বললে 'ছোটদের এত কথা বলার দরকার কী'– বলে তার মুখ বন্ধ করে দেয়। দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কথা শোনার মতো শিক্ষক খুব কমই পাওয়া যায়। কন্যাশিশু যেহেতু কারো সঙ্গে তার সমস্যা শেয়ার করতে পারে না, এর ফলে সে ভয় পায় এবং ক্রমান্বয়ে ভীতু নারীতে পরিণত হয়।

কন্যাশিশুরা বাসায় আত্মীয়-স্বজন, সৎভাই, মা-বাবার বন্ধু, গৃহপরিচালক দ্বারা অনেক সময় শারীরিকভাবে নিগৃহীতহয়। এটা সেই বয়সে তার জন্য খুব অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। এধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে কন্যাশিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ মায়ের তাকে সাপোর্ট দেওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের সমাজে উল্টোটা হয়। প্রথমত মা তার কথা বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়ত তাকে বিষয়টি চেপে যেতে বলে। যেখানে অপরাধীকে ডেকে সর্তক করা উচিত সেখানে আমাদের সমাজে কন্যাশিশুকেই সর্তক করা হয়। তাকে নানা পোশাকে আবৃত করা হয়। তাকে ঘরে বন্দী করা হয়। ফলে অপরাধীর আরও অপরাধ করার ইচ্ছা জাগে। অন্যদিকে কন্যাশিশুটি চরম অসামাজিক হয়ে যায়।

*** লেখক ও উপ-পরিচালক, পাবলিক ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন**

আমাদের দেশের কন্যাশিশুরা নিরাপত্তার কথা ভেবে সাধারণত বাইরে একা যাতায়াত করে না। কন্যাশিশুর জন্য আমাদের দেশে পাবলিক বাস সার্ভিস মোটেই নিরাপদ নয়। অসংখ্য কন্যাশিশু বাসের যাত্রী/হেলপার দ্বারা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়। এবয়সটা এমন যে কন্যাটি বাসে তার সঙ্গে এধরনের ঘটনা ঘটলে সে প্রতিবাদ করতে পারে না। চিৎকার করতে পারে না। সে বিষয়টা বুঝতেও পারে না। সে ভয়ে কুকড়ে যায়। এর ফলে সে পরবর্তীতে ঘর থেকে বের হতে চায় না।

আমাদের দেশের কন্যাশিশুদের মায়েরা তাদের পিরিয়ড হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে কোনো ধারণা দেন না। সুতরাং প্রথম পিরিয়ড আমাদেরদেশের কন্যাশিশুদের জন্য একটা আতঙ্কের দিন। এ বিষয়টি যে একজন নারীর জন্য খুব স্বাভাবিক সেই ধারণাই আমাদের দেশের কন্যাশিশুরা পরিবার থেকে পায় না। স্কুল-কলেজের সহপাঠীরাও এ বিষয়টি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। কন্যাশিশুদের কাছে পিরিয়ড তার শরীরের সুস্থ অবস্থার প্রকাশ না হয়েহয়ে ওঠে আতঙ্কের নাম। এ আতঙ্ক সে সারা জীবন বয়ে চলে।

আগেই বলেছি আমাদের দেশের কন্যাশিশুরা ঘরে-বাইরে পুরুষদের দ্বারা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়। অনেক সময় সেটা ধর্ষণের পর্যায়ে যায়। দেশের বিভিন্ন ক্লিনিকে ঘুরলে দেখা যাবে অসংখ্য কন্যাকে যাদের মা-বাবা তাদের গর্ভপাত করাতে সেখানে নিয়ে এসেছে। দিন দিন তা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের কারিকুলামে সেক্স অ্যাডুকেশন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। যার ফলে কিশোরীদের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ সম্পর্কে ধারণা থাকে না। বাসাতেও মায়েরা কখনো টিএজ মেয়েদের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করেন না। বিবাহ বর্হির্ভূত অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ভয়াবহতা (শারীরিক ও মানসিক) শিশুকেই বহন করতে হয়। যার ফলে সেই কিশোরী যখন নারীতে পরিণত হয়, তখন যৌনতার প্রতি তার ভয় সৃষ্টি হয়। গর্ভপাতের ফলে কিশোরীদের শারীরিক নানা অসুবিধা দেখা দেয়। আমাদের দেশে কিশোরীরা এখনও পিরিয়ডের সময় পুরানো কাপড় ব্যবহার করে থাকে বিধায় নানা রকম অসুখের সম্মুখীন হয়। বাজারে নারীর অতি প্রয়োজনীয় স্যানিটারি প্যাডের দাম অত্যধিক বেশি থাকায় বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবারের মেয়েরা প্যাড ব্যবহার না করে পুরানো কাপড় ব্যবহার করে। এজন্যই পরবর্তীতে তারা জরায়ুর নানা সমস্যায় ভোগে। নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় স্যানিটারি প্যাডের দাম কমানোর বিষয়ে আশা করি যথাযথ কর্তৃপক্ষ নজর দিবেন।

শহরে ও গ্রামে আমাদের দেশের মেয়েরা যখন শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়, তখন তাদের পোশাকের দিকে সকলে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে। দেখা যায়, পুরুষ নয়, অনেক নারীও কিশোরীর পোশাকের সমালোচনা করে। পোশাক কখনো কারো নিগৃহীত হওয়ার বিষয় নয়, অপরের দৃষ্টিভঙ্গি এর জন্য দায়ী।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ বাসায় একজন কিশোরী ছেলে ও একজন কিশোরী মেয়ে থাকলে দেখা যায় বাসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলেটির সিদ্ধান্তকে আমলে

নিলেও মেয়েটির সিদ্ধান্তকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে কিশোরী মেয়েটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মেয়েবেলায় নষ্ট করে দেওয়া হয়।

একবিংশ শতাব্দীতেও দেখা যায় বেশিরভাগ পরিবারে বাসার ছেলেটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েটির চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়। ফলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকে এমন ধারণা নিয়ে বড় হয় যে, তারা কোনো কিছু পুরুষের চেয়ে বেশি পাবে না। ধীরে ধীরে তারা হীনমন্যগ্রস্ত নারীতে পরিণত হয়। তাদের চাওয়া-পাওয়া কমিয়ে আনে। কিশোরী বেলা থেকেই তারা এমনভাবে বড় হয় যে, তাদের চাওয়া পাওয়া বা মুখ ফুটে বলার কিছু নেই।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ স্কুল-কলেজে ভালো টয়লেট না থাকায় মেয়েরা প্রশ্রাব-পায়খানা চেপে রাখে, ফলশ্রুতিতে নানা অসুখে পড়ে। দেখা যায়, তাদের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে পরিবারের তেমন একটা আগ্রহ থাকে না।

বাংলাদেশের কিশোরীরা পরিবার থেকে তাদের প্রতি খুব কম সহানুভূতি পায় বলে তারা পরবর্তীতে সহানুভূতিশীল মানুষ হয় না। এজন্য দেখা যায় তারা অপর নারীর প্রতিও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে না।

ব্রোকেন ফ্যামিলির কিশোরীরা প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে থাকে। তারা মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন কারো কাছ থেকে সহায়তা পায় না। তাদেরকে নিয়ে বাইরে নানা রকম কথা হয় এবং ধীরে ধীরে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলে।

বাল্যবিবাহ এখনো আমাদের সমাজে শহরে ও গ্রামে খুবই কমন। কোভিড পরিস্থিতিতে অসংখ্য মেয়েকে পড়াশোনা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বয়স্ক পুরুষকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে অনেক কিশোরী মা-বাবার কাছে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, কিন্তু তাদের সেসময়ে বলার জন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার উপায় ছিল না।

আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল না করলে তারা কখনো কারো কাছে সহানুভূতি পায় না। তাদেরকে কেউ উৎসাহ দেয় না। বকাঝকা হয় তাদের সঙ্গী। যার ফলে অনেকে আত্মহত্যা করে, যা খুব দুঃখজনক।

কিশোরীদের সমস্যাগুলো আমরা যেহেতু চিহ্নিত করতে পেরেছি, তাই পরিবার বা সমাজের কাজ হলো তাদের অসুবিধাগুলো দূর করা। সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কন্যাশিশুকে মর্যাদা দেওয়া এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। কন্যাশিশুর কথা শোনা। পরিবার ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের এযুগের কন্যাশিশুদের সকল বিষয়ে সহানুভূতিশীল থাকা। তাদের বুঝতে পারা। আমরা চাইব কোনো কন্যাশিশুই যেন পরবর্তীতে মেরুদণ্ডহীন নারীতে পরিণত না হয়। প্রতিটি কন্যাশিশু সমাজের বোঝা না হয়ে যেন তার কাজের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত হয়– সে বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের।



লাভলী মানসী দাজেল*

গারো কন্যাদের আশীষ

জাগো, জাগো, এ ধরার কন্যারা। হ্যাঁ, সর্বজাতির কন্যাশিশুরা আজ জেগে উঠেছে। সুনাম বয়ে নিয়ে আসছে। মাঠে, ময়দানে, অফিস আদালতে, ঘরে বাইরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। ঘরে বিভিন্নভাবে বৈষম্য করা হয়, তাই শিশু কন্যারা প্রতিনিয়ত নিগৃহের শিকার হয়। তবুও প্রতিটি জীবন পদক্ষেপে বাধা পেরিয়ে দৃঢ়তায় জীবন গঠনে অদম্য উৎসাহে সম্মুখপানে কন্যাশিশুরা এগিয়ে যাচ্ছে। গারো শিশু কন্যারা এ প্রেক্ষাপটের বাইরে নয়। তারাও এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যেতে হবে। কেননা এ ধরিত্রীতে সবার সমান অধিকার। এখানে নিজস্ব চেতনায় ও নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গারো সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হলো মাতৃকূলীয় বংশ পরিচয়। মায়ের গোত্র ধরেই বংশ গণনা করা হয়, অর্থাৎ মায়ের পদবিকেই সন্তানেরা ধারণ করে থাকে। ষাট/সত্তর দশকে গারো সমাজের অনেক পিতারাই ছেলে-মেয়েদেরকে তার পদবি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এতে নানান সমস্যার উদ্ভব হয়। তবে সমাজব্যবস্থা যাই হোক না কেন, পরিবারের কর্তা হিসেবে পিতাই পরিবারকে পরিচালনা করে থাকেন। সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাতৃসূত্রীয় অধিকার প্রথা। এই সূত্র অনুসারে কেবল কন্যাসন্তানরাই পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। গারোদের সম্পত্তি মাহারী সম্পত্তি, কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এজন্যই গারো সম্প্রদায় পূর্বে বা এখনও কন্যাসন্তানকেই প্রথমে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ছেলেসন্তানেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে না, তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত। তবে বর্তমান সময়ে দেখা যায় যদি পরিবারে ছেলে ও মেয়ে সন্তান থাকে, সেখানে ছেলেসন্তানদেরকেও কিছু না কিছু সম্পত্তি দেওয়া হচ্ছে।

যাই হোক, জাতীয় কন্যাশিশুদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত এই প্রকাশনায় আমি গারো জাতির কন্যাশিশু বা নারীদের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। শুরুতেই গর্বের সঙ্গে বলতে পারি সাফল্যের কথা– ফুটবল অঙ্গনে মারিয়া,

* লেখক ও উন্নয়নকর্মী

শিউলিরা সামান্য সুযোগ নিয়েই মাঠ দখল করে নিয়েছে। দেশের জন্য তথা গারো জাতির জন্য সুনাম অর্জন করে চলেছে।

অতীতে গারো জাতি-গোষ্ঠী বসবাসের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছিল। গারোদের ইতিহাসে, গান, কবিতা, লোকসংগীতের মধ্যে জুম চাষ কৃষি পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর আমাদের গারোদের একটি দল সমতলভূমি বাংলাদেশে বসবাস করছে। পাহাড়ে অবস্থানকালে প্রত্যেক পরিবার এক এক খণ্ড জঙ্গল বেছে নিয়ে গাছগুলো কেটে ফেলে জঙ্গল পরিষ্কার করত এবং কেটে ফেলা গাছগুলো শুকিয়ে গেলে আগুনে পুড়ে ফেলত। এভাবেই জমি তৈরি করে শক্ত কাঠি বা লোহার জিনিষ দিয়ে গর্ত করে বিভিন্ন ধরনের বীজ (ধান, ভূট্টা বিভিন্ন ধরনের শাক-শব্জি আলু ইত্যাদি) রোপণ করতো, যেটি জুম চাষ নামে সমধিক পরিচিত। পাহাড়ি জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ জুম চাষে সমধিক পরিচিত। মা তার কন্যাদেরকে নিয়ে দলগতভাবে জুমের চাষ করত। আর পুরুষেরা অধিকাংশ সময় পশু-পাখি শিকার এবং যুদ্ধ করার জন্য ঘরের বাইরে সময় কাটাতো। অধিকাংশ সময় অনেক পুরুষের ঘরে ফেরার সুযোগ হয়নি। এ ধরনের চাষাবাদ এবং পুরুষবিহীন জীবন-যাপনের কারণে নারীরাই ঘরের কর্ত্রী হয়ে সবকিছু দেখাশোনা করত। এ পরিস্থিতিতে স্বামীদের মৃত্যুর পরও যাতে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর থাকে, সেই কারলেই নারীদের নামেই জমি লিখে রাখা হতো, যা বর্তমানেও চলছে। এখান থেকেই গারোদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে, তথা নারীদেরকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। সম্পত্তির সত্তাধিকার বা উত্তরাধিকারী না হলেও, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মতো সাধারণত পরিবারের কর্তা হিসেবে পিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পরিবারের কর্তা হিসেবে পিতাই অধিকাংশ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। পরিবারে বড় ভাই থাকলে বাবা ও বড় ভাই, উভয়ের (বাবা/বড় ছেলে, মা) মতামত বা সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজগুলো করে থাকে।

গারোদের সমাজব্যবস্থা মাতৃগোষ্ঠীয়। তাই পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় কন্যাসন্তানেরা। তবে কন্যারাই যে সব সম্পত্তির মালিকানা হবে তা নয় (কিছু অংশ পাবে)। গারো ব্যবস্থা অনুযায়ী সাধারণত সবচেয়ে ছোট বা কনিষ্ঠতম কন্যাকেই ঘরের সম্পত্তির মালিকানা হিসেবে গোষ্ঠীগত এবং পারিবারিকভাবে নির্বাচন করা হয়। সেই নির্বাচিত কন্যাকে বলা হয় 'নকনা'। নকনাকে অবশ্যই বাবার নিকটতম আত্মীয় গোষ্ঠী বা পদবির ছেলেকে বিয়ে করতে হয়। আর সেই জামাইকে বা নকনার স্বামীকে বলা হয় নক্রম। কন্যা নকনা ও জামাই নক্রম-এর কাছেই মাহারী সম্পত্তি গচ্ছিত বা সংরক্ষিত থাকে। কারণ একজন নকনার ওপর মা-বাবার ভরণ-পোষণ, সম্পত্তি রক্ষা করা এমনকি পরিবারের ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনদের আতিথেয়তার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। আর যদি ঐ পরিবারে কোনো কন্যাসন্তান না থাকে, তবে কোনো আপন বোনের কন্যাকে নকনা করার সুযোগ থাকে। বোনেরও

যদি কন্যাসন্তান না থাকে, তবে কোনো নিকটাত্মীয়ের কন্যাকে আলোচনাসাপেক্ষে নকনা মনোনীত করা হয়। আর এই ধরনের নকনা মনোনীত করার পরআপন গোত্রের সকলকে নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে ছেলেসন্তানদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছেলেসন্তানদেরকে ছ্রা বলা হয়। ছ্রারাই সমস্ত মাহারী অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্তের মালিক ।ছ্রাদের সিদ্ধান্ত বা মতামতকে সাধারণত কোনোদিনও পরিবর্তন করা হয় না। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অনেকগুলো পশু কেটে ধুমধাম সহকারে রান্না-বান্না করে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সবাইকে অবহিত করা হয়। মাহারী সম্পত্তি যেন গোত্র/মাহারীর বাইরে চলে না যায়, বংশধারা যেন রক্ষা করতে পারে সেই জন্যই এই নকনা প্রথা। তবে নকনা বা নক্রম কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে পারিবার বা আত্মীয়-স্বজনরা তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন, এমনকি তাদের নকনা-নক্রম হওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

ঐতিহ্যগতভাবে গারো সমাজে বিধবা পুনর্বিবাহ প্রচলিত থাকলেও তত বেশি কার্যকর নয়। গারোদের বিবাহ প্রথা মাতৃতান্ত্রিককে ঘিরেই ছেলেকে মেয়ের বাড়িতে জামাই করে নিয়ে আসা হত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে অনেক শিক্ষিত ও সামর্থ্যবান ছেলে মেয়েকে বউ করে নিজ ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ গারো যুবক শিক্ষিত হওয়ায় বিভিন্ন শহরে, দেশ-বিদেশে চাকরি করে উপার্জনক্ষম হওয়ায় জমির ওপর বা মাহারী সম্পত্তির ওপর বেশিরভাগ নির্ভরশীল হচ্ছে না। তারা স্বাধীনভাবে নিজস্ব স্বকীয়তায় প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পরিবার রচনা করছে।

গারো শিশুকন্যারা বা গারো নারীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভালোবাসেন। নিঃসন্দেহে তারা দক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমী কর্মী। সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে সুঠাম ও পরিশ্রমী করেই সৃষ্টি করেছেন। বাড়ির সব কাজ ও বাইরের সব কাজেই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরা এমনকি শিশুকন্যারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। নারী ও শিশুকন্যা হিসেবে নিজেদের মান-সম্মান ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের মাহারীর ভাই/মামা অন্যান্যদের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। নারী সব অনুষ্ঠানেই পুরুষদের সঙ্গে অংশগ্রহণের অধিকার রাখে, কিন্তু আগে অনুষ্ঠান পরিচালনায় নারীদের সুযোগ ছিলনা। বর্তমানে খ্রিষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় কোনো কোনো অনুষ্ঠান নারীদের দ্বারাও পরিচালিত হচ্ছে। নারীদের অধিকারকে আরও বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সত্য কথা হলো, গারোরা একে অপরের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাই গারো নারী এবং পুরুষের সম্পর্ককে সহযোগিতার সম্পর্ক বলা হয় ।বাস্তবতায় অতীতে যা দেখেছি গ্রামে যখন নলকূপ ছিল না, তখন নারী-পুরুষ, ছেলেসন্তান ও কন্যাশিশুরা দূর থেকে নদী বা কারোর কূপ থেকে হাড়ি-পাতিল ও কলসী ভরে একত্রে পানি সংগ্রহ করেছে। ঘরের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ যেমন, রান্নার জন্য পাহাড় থেকে লাকড়ি জোগাড় করা, জমিতে ধান লাগানো, ধান কাটা, ধান ঘরে তোলার

কাজগুলো একত্রেই করে এসেছে।

তারপরও গারো সমাজে গারো নারী বা শিশুকন্যাদের জীবনে বৈষম্য দূর হয়নি। বাস্তবতায় দৃশ্যমান হয় যে, সারাদিন পরিশ্রম করে আসার পরও কাজের শেষ নেই। পরিবারের জন্য খাবার রান্না করা, খাওয়ানো, ধোয়া-মোছা ইত্যাদি করে থাকে। গারো নারীরা বা কন্যাসন্তানেরা দেখতে সুশ্রী, অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, বিনয়ী ও শক্তিশালী, যে কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বর্তমান শিক্ষিত কর্মচাঞ্চল্য পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কাজ করেন। কিন্তু স্ত্রীদেরকে অফিস শেষে গৃহস্থালির কাজও করতে হয়, তারপরও বিধাতা প্রদত্ত স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয়না। গারো নারীরা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে অনেক ক্ষমতায়িত হয়ে আছে। শিক্ষা ও সম্পদ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। গারো শিশুকন্যাদের নিজস্ব সমাজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে কোনোদিন কখনও বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, আশা করি আগামী দিনেও হবেনা। গারো শিশুকন্যারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয় না। কন্যাশিশুদের ভ্রুণ হত্যা হয় না, বরং কন্যাসন্তান লাভে বংশ রক্ষা হবে বলে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ প্রার্থনা উৎসর্গ করে।

স্বাক্ষরতার সংজ্ঞা অনুসারে অধিকাংশ গারো নারীই শিক্ষিত। ষাট দশক থেকেও যদি দেখি তখনকার সময়েই গারো নারীরা বিএ পাস করে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরি শুরু করেছে। সত্তর দশক থেকে গারো নারীদের শিক্ষার অগ্রগতি আরও অনেক বেড়ে চলেছে। এনজিও-এর পরিচালনায় প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সঠিক সময়ে ছেলে-মেয়েরা স্কুলগামী হতে পেরেছে। ফলস্বরূপ বর্তমানে আমরা দেখতে পাই অনেক গারো নারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করে চলেছে। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কলেজের প্রভাষক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, সেবিকা, লেফটেন্যান্ট (সেবিকা), পুলিশ অফিসার, পুলিশ কন্সটেবল, এয়ার হোস্টেস, বিভিন্ন কোম্পানি ও এনজিও কর্মকর্তা হিসেবে তারা কাজ করে চলেছেন। এছাড়াও সামাজিক ও পারিবারিক স্বাধীনতার দিকেও যদি দেখি, তাহলে দেখব যে নারীরা বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন, বিউটিশিয়ান, গৃহকর্মী, পোষাক শিল্পে চাকরি করে পরিবারকে সাহায্য করে চলেছেন এবং অন্যান্য ঝরে পড়া মেয়েদেরকে কর্মজীবী নারীরাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিউটিশিয়ান হিসেবে কাজ করার সুবিধা করে দিচ্ছে। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের বেকারত্ব জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছেনা। সৃষ্টিকর্তা পুরুষকেই শুধু শক্তি দেননি, তিনি নারীদেরকেও সমপরিমাণে শক্তি দিয়েছেন। সেই সৃষ্টিকর্তার দেওয়া উপহার ক্ষমতাকে নারীরা অর্থপূর্ণভাবে ব্যহার করে চলেছেন।

গারো নারী ও শিশুকন্যা সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে সামাজিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক

কাঠামোতে শক্ত অবস্থানে আছে বলে মনে হয়। সম্পদে, শিক্ষায় ও প্রাচুর্য্যে গারো শিশুকন্যারা অভয়ারণ্যে থাকার কথা, কিন্তু হায়েনার লোলুপ দৃষ্টিতে প্রায়শই তারা আজ বাধাগ্রস্ত। স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। তাদের সুযোগ থাকার কথা। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে গারো শিশুকন্যার জীবন পূর্ণ প্রস্ফূটিত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। সহজ-সরলতার কারণে অনেক সময় জীবনের মাঝ পথ থেকে তারা হারিয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক প্রত্যারণার শিকারে জীবন লুটিয়ে পড়ে। অনেক সম্ভাবনা থাকে বা আছে, কিন্তু কে দায়িত্ব নিচ্ছে? কে রক্ষা করবে? কে সুযোগ করে দিবে?

আমি মনে করি, সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে গারো শিশুকন্যারা অনেক অনেক সাফল্য দেখাতে পারবে।

তথ্যসূত্র: গারো উপজাতির মাতৃতন্ত্র, গারো সমাজে বিয়ে ব্যবস্থা, গারো সমাজের নানা প্রথার ক্রম বিপর্যয়, রেভা ফাদার ক্লেমেন্ট রিছিল, জানিরা, ৮ম সংখ্যা, ১৯৮৮, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি।



শাওন মাহমুদ*

বাঁধন বিরাম

পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা। প্রত্যেকের ভাবনা আলাদা। প্রতিটা মানুষের মতামত, সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ একেবারে ভিন্ন। মানুষ সামাজিক জীব। পৃথক সত্তা থাকার পরও বিভিন্ন ধরনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়। বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মীর মতন সম্পর্কগুলো সামাজিক বন্ধনে চলমান। তবে বিবাহ, এমন একটি বন্ধন যার আরেক নাম বৈধ চুক্তি। এর মাধ্যমে দুজন মানুষের মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য অনুযায়ী বিবাহের সংজ্ঞার তারতম্য থাকলেও সাধারণভাবে বিবাহ এমন একটি বাঁধন যার মাধ্যমে দুজন মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও যৌন সম্পর্ক সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করাকে বোঝায়। আমাদের দেশের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য অনুযায়ী যে কোনো প্রকারের যৌন কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিবিধ নীতি-নিষেধ দেওয়া হয়। পূর্ণ বয়সে স্বাভাবিক নিয়মে জৈবিক চাহিদা সম্পন্ন করার জন্য বিবাহ বাধ্যতামূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে, বিবাহকে একটি বৈশ্বিক সর্বজনীন সংস্কৃতি এবং চুক্তি হিসেবে দেখা হয়। পৃথিবীর সব দেশেই আয়োজন অনুষ্ঠান করে ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। বৈবাহিক কার্যক্রম সাধারণত দম্পতির মাঝে সমাজ-স্বীকৃত বা আইনগত দায়িত্ববোধ তৈরি করে এবং এর মাধ্যমে তারা বৈধভাবে স্বেচ্ছায় সন্তান-সন্ততির জন্ম দিতে পারে।

বিবাহ মূলত একটি ধর্মীয় রীতি হলেও আধুনিক পৃথিবীতে এটাকে একটি আইনি প্রথা হিসেবে দেখা হয়। সে কারণে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক অবৈধ বলে স্বীকৃত এবং ব্যভিচার হিসেবে অভিহিত একটি পাপ এবং অপরাধ। অন্যদিকে স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো সময় সঠিক প্রমাণ বা সাক্ষীর সাহায্যে আইনি সহায়তায় বিবাহ নামের বাঁধনে বিরাম টানতে পারে। যদিও আমাদের দেশের মতন অনেক স্থানেই সামাজিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদকে অত্যন্ত নিম্নমানের সিদ্ধান্ত বলে ধরা হয়।

আমাদের দেশে বিবাহ নামের সম্পর্কটি শুধু নিজ ইচ্ছায় করার চল স্বাধীনতা

*** কলাম লেখক ও নগরচাষী**

পায়নি। ছেলে বা মেয়েকে এখনো অনেক পিতামাতা বা পরিবার তাদের পছন্দে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। এমনকি বাল্যবিবাহ অহরহ হয়ে থাকে। ভালো বা মন্দ থাকা নয়, সামাজিক অবস্থানকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তখন সবচেয়ে বেশি। আবার অন্যদিকে নিজ পছন্দে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়াতে সামাজিক অবস্থানের চেয়ে তাদের ভালো-মন্দ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন পিতামাতা, পরিবার, সমাজ।

২০২১-এ এসে এক জরিপে দেখা গেছে, আমাদের দেশে বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ হিসেবে বিভিন্নজনের ভিন্ন ভিন্ন মতামত শোনা যাচ্ছে। এর মাঝে কয়েকটি মতামত সম্মিলিতভাবে দায়ী বলে মনে করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, সামাজিক নেটওয়ার্ক অর্থাৎ সর্বজনীন প্রোফাইলে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, অর্থনৈতিক স্থিরতা, নারীদের কাজ, সুযোগ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি, পুরুষদের জিনগত কর্তৃত্ববাদ, পরিপক্বতার অভাব, একক পরিবার গঠন, বিভিন্ন মাধ্যমে সহজলভ্যতায় ব্যক্তিগত আলোচনা এবং শ্রদ্ধার জায়গাগুলোতে অনাগ্রহী, বাহ্যিক তৃপ্তিবোধে অসীম চাহিদা, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অস্থিরতা, দায়িত্বে ভারসাম্যহীনতা, বহুগামিতা, বই বা জার্নাল পড়ার অভ্যাস হ্রাস, চলচ্চিত্র বা নাটকে বাস্তবতার অভাব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধারাবাহিক উত্থান, সন্দেহ, অনির্ভরতার মতন বিষয়গুলো। সবগুলোই একের সঙ্গে অপরে জড়িয়ে শক্ত জট পাকানো। সমাধান খুঁজতে যাওয়া আজকাল বোকামি করা বলে ধরা হয়।

আমি একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব নারী। একান্ত আপন ভাবনায় যখন বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত বিবাহ বিচ্ছেদের শঙ্কাগুলো নিয়ে আশঙ্কা করি। তখন মনে হয়, আমাদের দেশে আমার বয়সী বা তার ঊর্ধ্বে বেশিরভাগ মানুষ, অন্য মানুষ কী বলবে– এই এক বাক্যকে কেন্দ্র করে নিয়ে জীবনে চলছে। পরিবার, সমাজকে আগে ভাবে, নিজেকে মানুষ নয়, রোবট করে তোলে তারা। কে খুশি হবে, একটু ভালো বলবে তা নিয়েই দিন পার করে। সন্তানরা বড় হয়ে গেলে নিজেকে বৃদ্ধ ভাবতে শেখে। সমাজ বা পরিবার আমাদের নিয়ে ভাবার অবকাশ দেয়নি কখনো।

সেক্স অ্যাডুকেশন বলতে কিছুই ছিল না তখন। মা-খালারা যদিও শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে কিছুটা কথা বলেছেন, তাতেই লজ্জা ঘিরে ধরেছে আমাকে এবং তাদেরকে। ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনো কথা বলতেন না তখনকার পরিবারগুলো। বন্ধু বা বই থেকে যতটা বুঝেছে, তাতেই নিজেদের সবজান্তা মনে করে ফেলত তারা। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নারী এবং পুরুষের শারীরিক বা মানসিক চাহিদা পরিবর্তন নিয়ে কখনো কেউ কথা বলেনি। দাম্পত্য জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়, এই শারীরিক সম্পর্কের আরেকটি ধাপ ম্যারিটুয়াল রেইপ মূলত বর্তমানেও খুব একটা আলোচনার বিষয় হয় না। এখনো যে কোনোভাবেই হোক সেক্স অ্যাডুকেশনকে ট্যাবু হিসেবেই ধরা হয়। সুতরাং বিবাহ নামের চুক্তিনামায় কোনো

না কোনোভাবে মানুষকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেনে নেওয়া বা মানিয়ে চলার মতন দায়বদ্ধতায় আটকানো হয়েছে।

এমন বিভিন্ন অব্যক্ত সমস্যায় জর্জরিত, ধরে নিন আমি আমার বা তার ঊর্ধ্ব বয়সী নারীদের এই সময়ের মতন বিকল্প বা সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ খোলা থাকলে, আমাদের সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের হার এখন থেকে খুব একটা কম হতো না। আগে পুরুষরা একচ্ছত্র বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবহার করে এসেছে, কারণ নারীর বিকল্প পন্থা বলে কিছুই ছিল না। স্বামী আরেকটি বিয়ে করে আনলে নিজ ঘর ছেড়ে দিয়েছে তারা। সমাজ, পরিবার, সন্তানরা কী বলবে, ভাবতে ভাবতেই বহু নারী অতিষ্ঠ দলিত জীবন পার করেছে, করছে এখনো। শারীরিক চাহিদা বা মানসিক শান্তির কথা না ভেবে মুখ বন্ধ করে সংসার চালিয়ে গেছে। এমনকি সংখ্যায় কম হলেও কিছু পুরুষেরও এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে মুখ বন্ধ করে পরিবার টিকিয়ে রেখেছে, রাখছে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার পরিবেশ সত্যি বলতে কেউ পায় না।

সহনশীলতা যখন একতরফা একচক্রে ঘুরতে থাকে তখন তার পরের প্রজন্ম সহ্য, ধৈর্য বা স্পর্শকাতর হওয়ার থেকে অস্থির, অধৈর্য এবং হালকা মনোভাবে নিজেদের তৈরি করে। আস্থাহীনতা, অনির্ভরতা এবং অবিশ্বাস তাদের ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। সন্দেহ হয়ে ওঠে তখন তাদের প্রধান অস্ত্র। সম্পর্কের গভীরতা সন্দেহের কঠিন জালে আটকে যায়। আজকাল সমাধান খুঁজতে সময় ব্যয় করে না কেউ আর। বিকল্পের কমতি নেই, তাই বাঁধনে বিরাম টানতে তেমন আক্ষেপও থাকে না। কথা বলার বা সমাধান আনার প্রচেষ্টা কেউ করে না। অস্থির মন আজকের দিনটা পার করতে পারলেই আগামী সকাল নতুন দিন ভাবে। দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক রক্ষায় সময় অপচয় করতে নারাজ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এক এক করে নতুন শূন্যতার সৃষ্টি হতে থাকে। শূন্যস্থান পূরণ হয়, শূন্যতা নয়।

বিবাহ যখন একখানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় বৈধ চুক্তির সংজ্ঞায় পড়ে তখন বাঁধন বিরাম বা বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে কথা বলাতে সমস্যা দেখা দেয় এবং তা কখনো কারও সঙ্গেই একমত হওয়ার নয়। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এসব বিষয়ে মতামত দিয়ে থাকে। আমি প্রত্যেকের মতকে শ্রদ্ধা করি। কারণ যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে শুধু নিজের ভালো-মন্দটাই স্পর্শ করতে পারে, অন্যেরটা নয়।

তার পরও আমি বারবার নারী-পুরুষ সম্মিলিত সবার কাছে অনুরোধ জানাতেই থাকব, বারবার মরে যাওয়ার চেয়ে নিজেদের সমস্যা নিয়ে কথা বলুন। সমাধান খুঁজুন। সিদ্ধান্ত নিজেদের মতন করে নিন। তার পর একবার হলেও নিজের মতন করে বাঁচুন– জীবন সুন্দর।



শান্তা মারিয়া*

কন্যাশিশুকে আত্মমর্যাদার পাঠ দিন

কন্যাশিশু জন্মালে মুখ অন্ধকার করা, কন্যাশিশুকে আধখানা ডিম দিয়ে ছেলের প্লেটে পুরো ডিম, মুরগির রান তুলে দেওয়া এখনও সেসব থাকলেও অনেক কমেছে নিশ্চয়ই। আজ থেকে বিশ বা ত্রিশ বছর আগে কন্যাশিশুর প্রতি যে বৈষম্যমূলক চিত্র দেখা যেত তা এখনও পুরোপুরি দূর না হলেও কিছুটা অবশ্যই কমেছে। বিশেষ করে শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারগুলোতে এখন দৃশ্যপটের অনেক বদল ঘটেছে। এখন ছেলেশিশুর পাশাপাশি মেয়েশিশুকেও স্কুলে পাঠানো হয়। তার লেখাপড়ার জন্যও মা-বাবা একই রকম যত্নশীল থাকেন। ছেলে ও মেয়েকে এখন অনেক পরিবারেই একই রকম খাবার দেওয়া হয়। তাদের উচ্চশিক্ষাতেও বাবা-মা মনোযোগ দেন।

তবে হ্যাঁ, এখনও নারীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অন্তরায় রয়েই গেছে। লেখাপড়ার মধ্যেই ভালো পাত্র পেলে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার ঘটনা এখনও ঘটছে। তবে কমেছে।

এসব সমস্যা নয়। আজকে এখানে আমি অন্য একটা সমস্যা তুলে ধরতে চাই। সেটা হলো কন্যাশিশুদের আমরা কতটা আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারছি? কন্যাশিশুদের কতটা অনুপ্রেরণা দিচ্ছি স্বাবলম্বী হওয়ার? কতজন কন্যাশিশুকে আমরা খেলাধুলায়, বিজ্ঞান চর্চায়, ব্যবসায় অনুপ্রেরণা দিচ্ছি? কতজনকে পেশাজীবী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করছি? কতটা শক্তপোক্তভাবে তাকে গড়ে তুলছি?

কিছুদিন আগে কয়েকজন তরুণীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তারা দেশের একটি বেশ নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাদের অনেকেরই ইচ্ছা প্রবাসী ভালো ও প্রতিষ্ঠিত এবং ধনী ছেলেকে বিয়ে করা। বিসিএস পাত্রের প্রতিও অনেকের প্রবল আকর্ষণ। যারা চাকরি করতে চান তারাও অনেকে ভাবছে যে স্বামী যদি ভালো রোজগার করে, তাহলে সে আর চাকরি করবে না।

আমার মনে হয় এমন পরনির্ভর মানসিকতা যেন না হয় সেজন্য ছোটবেলা থেকেই

* লেখক ও সাংবাদিক

কন্যাশিশুকে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখানো উচিত। রূপকথার রাজপুত্র এসে রাজত্ব দিবে বা রাজসিংহাসনে বসাবে, অথবা বারবি পুতুলের মতো নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে চললেই একজন সুপার হিরোর দেখা পেয়ে যাবে– এমন চিন্তা থেকে কন্যাশিশুকে বের করে আনতে হবে।

অনেকেই আজকাল বলিউডের সিনেমা দেখে মেয়েকে ওই রকম নাচ শেখান। ভালো কথা। কিন্তু কজন তার মেয়েকে বিজ্ঞানের গবেষণা করার জন্য চিল্ড্রেন সেট কিনে দেন যেখানে ছোট্ট টেস্টটিউব, ছোট ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকে। কন্যাশিশুকে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতে উৎসাহ দেন কতজন? কতজন তাকে সাঁতার শেখান? ফ্যাশনেবল ড্রেস, একের পর এক কসমেটিকস, নিত্যনতুন ফ্যাশনেবল জুতার পরিবর্তে তাকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বই কিনে দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো তার মনোজগতটা অনেক উন্নত হবে। অনেক বাড়িতেই দেখা যায় ছেলেশিশুটি ল্যাপটপ চালাতে শিখে গেছে। কিন্তু মেয়েশিশুটি সেটা কম শিখেছে কিংবা তেমন আগ্রহ বোধ করছে না। ভাই যখন ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল খেলে, মেয়েটিকে তখন খেলতে পাঠানো হয় না। উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেকে বিদেশ পাঠানো হলেও মেয়েকে সেখানে পাঠানোর হার অনেক কম।

ছেলেকে যেমন ছোটবেলা থেকে বলা হয় তোমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, মেয়েকে অনেক ক্ষেত্রেই তেমন পাঠ দেওয়া হয় না। অনেক মা তার মেয়েকে রূপচর্চায় যতটা উৎসাহ দেন, জ্ঞানচর্চায় ততোটা দেন না। আমাদের সামনে চলচ্চিত্র শিল্পী, সংগীত শিল্পীরা যতটা অনুকরণীয় হন, ততোটা কিন্তু অন্য পেশাজীবীরা হন না। আমি চলচ্চিত্র শিল্পী বা কণ্ঠশিল্পীকে মোটেই অবমূল্যায়ন করছি না। কিন্তু একজন নারী কীভাবে ব্যারিস্টার হবেন, বিজ্ঞানী হবেন, পাইলট হবেন, লেখক হবেন, চিত্রশিল্পী হবেন, নভোচারী, প্রত্নতত্ত্ববিদ হবেন, যদি শিশু বয়স থেকে তাকে অনুপ্রেরণা না দেওয়া হয়? সংগীতশিল্পী হতে চাইলে তাকে সেটাও ভালোভাবে শিখতে হবে। ক্ল্যাসিকাল সংগীতের চর্চা করতে হবে। একদিনে স্টার হওয়ার মানসিকতা থেকে তাকে বের করে আনতে হবে। অভিনেত্রী হতে চাইলেও তাকে অভিনয়ের পাঠ দিতে হবে। সংগীত ও নাট্যকলা পড়তে হবে। শুধু সুন্দরী হওয়ার জন্য একটি মেয়ে ছোটবেলা থেকে চেষ্টা করতে থাকবে এটা খুবই বোকামি।

বিশ্ব এখন তথ্য-প্রযুক্তির। ছোটবেলা থেকেই কন্যাশিশুকে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে। আজকাল মধ্যবিত্ত ঘরে কন্যাশিশুকে ডাক্তারি পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু বেশিরভাগ মেয়ে এখনও ডাক্তারি পাশ করে গাইনিতে মেজর করে। অথচ দরকার সার্জারি, নিউরোলজিসহ সব ধরনের শাখায় নারীর পদচারণা।

বুয়েটে এখনও ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা কম। এখনও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মেয়ের সংখ্যা হাতেগোণা। কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামার একজন নারী। অথচ উদাহরণ ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কজন কন্যাশিশুকে তার কথা বলা হয়?

এবার আসি পারিবারিক নির্যাতন প্রসঙ্গে। এখনও অনেক পরিবারে ছোটবেলা

থেকেই কন্যাশিশুকে শেখানো হয় 'অ্যাডজাস্ট' করে চলতে। বিয়ের সময় এখনও স্বামীর সব অপমান সহ্য করে ধৈর্য্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়। এখনও আমাদের কন্যাশিশুদের মার খেয়ে মার হজম করার কুশিক্ষা দেওয়া হয়।

অথচ ছোটবেলা থেকেই তাদের শক্তপোক্ত করে গড়ে তোলা দরকার। দরকার আত্মরক্ষার শিক্ষা। বিশেষ করে শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যাশিশুরা যেন ফার্মের মুরগির মতো বেড়ে ওঠে। তারা দীর্ঘপথ হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না। শরীরে ও মনে দুর্বল হয়ে থাকলে তারা কীভাবে জীবনের পথে এগিয়ে যাবে? তারা যেন ছোটবেলা থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে, নিজেকে রক্ষা করতে শেখে সেসব শিক্ষা দেওয়া দরকার। শিশুকে দেওয়া দরকার ভালো স্পর্শ খারাপ স্পর্শের শিক্ষা।

কন্যাশিশুর বিকাশের পথে আরেকটি অন্তরায় অকালপক্ক প্রেম। কিশোরী বয়সে অনেক মেয়ে প্রেমে পড়ে, বিয়ে করে এবং নিজের সকল সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে ফেলে। এজন্য শিশুবেলা থেকেই তাকে উচ্চাশার স্বপ্ন দেখাতে হবে। তার লক্ষ্য যেন হয় নিজে কিছু হওয়া। স্বামীর ঘরই মেয়ের ঘর নয়। বরং তার নিজের রোজগারে যেন নিজের বাড়ি গড়ে তোলার, মনোবল ও ইচ্ছা থাকে।

আরেকটি অন্তরায় হলো বাঙালির মজ্জাগত বর্ণবিদ্বেষ। কোনো কন্যাশিশুর ত্বকের রঙ যদি শ্যামবর্ণ হয়, তাহলে ছোটবেলা থেকেই নানা রকম মন্তব্য করে তার আত্মবিশ্বাসের বারোটা বাজিয়ে দেওয়া হয়। খাটো হলেও একই অবস্থা। এজন্য পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে বাবা-মাকে সচেতন হতে হবে। কালো-ফর্সা, মোটা-রোগা, বেঁটে-লম্বা এসব গৎবাঁধা বস্তাপচা ধারণা থেকে তাদের নিজেদেরও মুক্ত থাকতে হবে এবং কন্যাশিশুকেও এগুলোকে নস্যাৎ করার মতো মনোবলসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও বড় ভূমিকা আছে। শিক্ষকদের কথায় ও আচরণে যেন কোনোভাবেই জেন্ডার বৈষম্য, বর্ণবাদী চিন্তা প্রকাশ না পায়।

প্রতিটি স্কুলে ছেলে-মেয়ে সবশিশুর জন্যই লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা দরকার। গান, নাচ, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, নাটক এগুলোর চর্চাও যেন সব শিশু করতে পারে তেমন ব্যবস্থা থাকা দরকার। একসময় শিশু সংগঠন, পাঠাগার আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই শিশুরা সম্পৃক্ত হতো। সেই ধারাটি আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। গার্লসগাইডে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার প্রতিটি গ্রামে, জেলায়। বয়েজ স্কাউট ও গার্লসগাইড আন্দোলন প্রতিটি শিশুকে মানবিক মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠতে সাহায্য করে। স্কুলের দেয়াল পত্রিকা, সংগঠন ইত্যাদির সঙ্গে যেন কন্যাশিশুরা যুক্ত হয় সেদিকে অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই সচেতনভাবে চেষ্টা করা উচিত। কন্যাশিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারলে সে ভবিষ্যৎ জীবনেও এগিয়ে যাবে।



শাহনাজ মুন্নী*

সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তন হলে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে

অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বর্বরতার অন্ধকার যুগ পেরিয়ে পৃথিবী এখন সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর ছুঁতে চলেছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে এখনো কন্যাশিশুরা উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

সাধারণভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই পুত্রসন্তানের তুলনায় কন্যাসন্তান বৈষম্য, অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়। বাড়ির ভালো খাবার, লেখাপড়ার অনুকূল পরিবেশ, স্বাধীনভাবে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে-ফিরে বাইরের পৃথিবীকে জানা-বোঝার সুযোগ পরিবারের পুত্রসন্তানটি যেমন অনায়াসে পায়, কন্যাশিশু তা পায় না। বাধা-নিষেধের নানা বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হয় তাকে।

পরিবারের আপনজনেরাই হয়তো কন্যার চাইতে পুত্রকে গুরুত্ব দেয় বেশি। ফলে জন্মের পর থেকেই নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কন্যাশিশুকে বড় হতে হয়। তার ওপর আছে অল্প বয়সে কন্যাশিশুকে বিয়ে দিয়ে দেবার প্রাচীন সামাজিক প্রবণতা। ১৮ বছর পেরুনোর আগেই অনেক পরিবারে কন্যাসন্তানকে পাত্রস্থ করার চেষ্টা চলে। বাংলাদেশে এখনো শিশুবিবাহের হার পৃথিবীর অনেক দেশের চাইতে বেশি। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও সেই কন্যাশিশুরা মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রচন্ড চাপে পড়ে যায়। কেউ হয়তো অপ্রাপ্তবয়সেই সন্তানের জন্ম দেয় এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তারা না পায় পরিপূর্ণ শিক্ষা, না পায় শারীরিক মানসিক যত্ন। একরকম ধুঁকে ধুঁকে তাদের পুরোটা জীবন কাটে।

তবে পাশাপাশি একথা স্বীকার করতে হবে যে গত কয়েক দশকে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে কন্যাশিশুর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আগের চাইতে বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন অনেক পরিবারেই দেখা যায় দুটি সন্তানই কন্যা বা একমাত্র সন্তানটি কন্যা। অনেক পরিবারেই পুত্রসন্তান লাভের আশায় একের পর এক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। বিবিসির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কন্যাশিশুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটি বড় কারণ অর্থনৈতিক। অর্থাৎ কন্যাসন্তানও যে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারে সেরকম

*** লেখক ও চিফ নিউজ এডিটর, নিউজ টুয়েন্টিফোর**

ঘটনার উদাহরণ সমাজে বাড়ছে। মেয়েরা এখন সাফল্যের সঙ্গে লেখাপড়া করে চাকরি নিয়ে অর্থ উপার্জন করছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে। অনেক স্বল্পশিক্ষিত নারী গার্মেন্টসে কাজ করছে। নিজের দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি তারা পরিবারের প্রতিও দায়িত্ব পালন করছে। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য এটি যথেষ্ট নয়, সত্যিকার অর্থে কন্যাশিশুর পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে আমাদের পাড়ি দিতে হবে আরও বহু পথ।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রীর হার ৫১ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী নারী। যদিও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এসে মেয়েদের উপস্থিতি কিছুটা কমে যায়। অর্থাৎ যতই উপরের দিকে যায়, ততই মেয়েরা ঝরে পড়তে থাকে।

তারপরেও সামগ্রিকভাবে গত বিশ-তিরিশ বছরে বাংলাদেশে নারীদের শিক্ষার হার, কর্মক্ষেত্রে অংশ নেওয়ার হার এবং আয় করার ক্ষমতা আগের চাইতে অনেক বেড়েছে। তবে দুঃখের বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যাসন্তানের সমানাধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটি সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা যদি খুঁজে দেখি কেন কন্যাশিশুকে অবহেলা করা হয় এবং তার পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহলে বোঝা যাবে, কন্যাশিশুর অধিকার আদায়ে কোথায় বাধা রয়েছে।

হাজার হাজার বছর ধরে নারীর প্রতি সমাজে প্রচলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান, আইন-কানুন ও সেগুলোর চর্চা বরাবরই নারীকে পেছনে টেনে ধরছে। আমাদের মনের গভীরে শেকড় গেঁড়ে বসা এসব চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার।

সবসময় ধরেই নেওয়া হয়, নারীরা অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রথম জীবনে বাবার, বিয়ের পর স্বামীর এবং বৃদ্ধ বয়সে ছেলের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ফলে তারা কখনোই পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারে না।

এখনো অনেক অভিভাবকই মনে করেন মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে পারলেই তাদের দায়িত্ব শেষ। কন্যাকে উচ্চশিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার চাইতে ঘর-সংসারের কাজ শিখিয়ে বিয়ের উপযুক্ত করে তোলার ব্যাপারে তারা অধিক আগ্রহী থাকেন। এমনকি কন্যাটি যদি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন, তখনো অনেক পরিবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে মান-সম্মানের দোহাই দিয়ে কন্যাটিকে আবারো তার স্বামীর সংসারে যেতে বাধ্য করে। যার ফলে নারীটিকে সারাজীবন দুর্বিষহ অত্যাচারের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়।

তাছাড়া সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, পুত্ররা হচ্ছে বংশের বাতি। তারাই পরিবারের দায়িত্ব নেয়। বংশের ধারা অব্যাহত রাখে। কন্যা যেহেতু বিয়ের পর পরের ঘরে চলে যায়, তাই তাকে দিয়ে বংশ রক্ষা সম্ভব নয়। এই সব পশ্চাৎপদ ধারণা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের কন্যাশিশু যারা পরর্তীতে নারী হয়ে ওঠেন তাদের অধিকাংশই ভোগেন চরম নিরাপত্তাহীনতায়। গ্রামীণ নারীই হোন বা শহুরে নারী কেউই নিজেকে শতভাগ নিরাপদ ভাবতে পারেন না। ঘরে-বাইরে সর্বত্রনানা রকমের হয়রানি, নির্যাতন ও নিপীড়নের ভয়ে তাকে সবসময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। ফলে কন্যাশিশুটি পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হতে পারে না। সমাজ তাকে 'মেয়ে মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত করে। মেয়ে মানুষ মানে ধরে নেওয়া হয় দুর্বল, শক্তিহীন, পুরুষের অনুগত, অধস্তন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তার স্বাধীন ইচ্ছা ও মতামতের কোনো মূল্যই দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশের সংবিধানে গুরুত্বের সঙ্গে নারী-পুরুষ সমতার কথা বলা হলেও বাস্তবে কন্যাশিশুরা সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় নানা বৈষম্যের শিকার। এর অবসান ঘটানো দরকার। সুখের বিষয় যে, সমাজে এখন কন্যাশিশুদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা আগের চাইতে বেড়েছে। পরিবারে যদি কন্যারা সার্বিক সহযোগিতা পায়, যদি মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পায়, প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পায়, তবে তারাও দেশের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। এর কিছু নজির আমরা বর্তমান সমাজে দেখতে পাচ্ছি। নারীরা বিভিন্নভাবে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। অদম্য লড়াকু মনোভাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনও বাড়ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে হলে নারীর প্রতি এই ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের হার কমাতে হবে। কন্যাশিশুকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং সবধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দেওয়া সবার কর্তব্য। নারী তার চারপাশের বাধার দেয়াল ভেঙে মুক্ত মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদায় জীবন-যাপন করুক– এটাই প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলাদেশে কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কী বদলেছে? ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, বিবিসি নিউজ বাংলা।

২. কন্যাশিশুরা ভাল নেই বাংলাদেশে, ১১ অক্টোবর, ২০১৬,ডয়েচে ভ্যালে, অনলাইন।

৩. নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার, মুহম্মদ মনিরুল হক, ১৫ অক্টোবর, ২০১৭, প্রথম আলো।



শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী*

ক্রমবর্ধমান অ্যাসিড-সন্ত্রাস: হুমকির মুখে আমাদের নারী ও কন্যাশিশুরা

বাংলাদেশে ২০০২ সালের আগ পর্যন্ত অ্যাসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য কোনো আলাদা আইন ছিল না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় অ্যাসিডসংক্রান্ত মামলার বিচার করা হতো। সেই সময় অ্যাসিডসংক্রান্ত অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং জনসচেতনতার প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড রেখে 'অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২' এবং 'অ্যাসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২' প্রণয়ন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কয়েক বছরে দেশে অ্যাসিড সন্ত্রাস ধীরে ধীরে কমে আসে। কিন্তু জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো'র গত ২৬ আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী অ্যাসিড সন্ত্রাস পুরোপুরি নির্মূল হয়নি, সম্প্রতি আবার ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে এটি। তাদের তথ্যমতে, ২০০২ সালে দেশে অ্যাসিডদগ্ধের সংখ্যা ছিল ৪৯৬, ২০১৮ সালে তা একেবারে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২২। ২০২২ সালে তা ২৯ হয়। অর্থাৎ অ্যাসিড-সন্ত্রাস ধীরে ধীরে আবার বাড়ছে।

করোনাকালে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতার কারণে অন্যান্য সহিংসতা ও নারী নির্যাতন যেমন বেড়েছে তেমনি অ্যাসিড সহিংসতাও বেড়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাসের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের সময় ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৭টি অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল এবং এতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল ২৩টি, মৃত্যু হয় একজনের। ২০২২ সালে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা বেড়ে দাঁড়ায় ২৯টি। এসব পরিসংখ্যান অ্যাসিড-সন্ত্রাসের সেই ভয়াবহ দিনগুলো আবার ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর এই সন্ত্রাসের সিংহভাগ শিকার যে নারী এবং কন্যাশিশু, তা কারো অজানা নয়। জাতীয় দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী অ্যাসিড-আক্রান্তদের ৯৯ শতাংশই নারী ও কন্যাশিশু এবং তাদের বয়স ১৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়া, সংসারে বনিবনা না হওয়া, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, যৌতুক ও অন্যান্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কিশোরী বা নারীরা

*** উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্টে কর্মরত**

অ্যাসিড-সন্ত্রাসের বলি হন। তবে আজকাল নারীর পাশাপাশি অনেক পুরুষের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগত শত্রুতার জের হিসেবে অ্যাসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটছে।

কিছুদিন আগের একটি ঘটনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নারী ফুটবল ও ক্রিকেট দলের সাফল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু এই দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক অনেক ধরনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এ পর্যায়ে আসতে হয়েছে। গত ২৯ জুলাই ২০২৩ হাফপ্যান্ট পরে খেলার অপরাধে খুলনার বাটিয়াঘাটার তেতুঁলতলা গ্রামে জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলের কিশোরী ফুটবলারদের স্থানীয় কিছু নারী-পুরুষ মারধর করার পর অ্যাসিড ছোঁড়ার হুমকি দিয়েছে। সাফ ফুটবলজয়ী নারীদেরও এ ধরনের সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আর আজকাল পত্রিকায়, ইউটিউব বা ফেসবুকে আমরা অহরহ দেখি পোশাকের কারণে বা টিপ পরার অপরাধে রাস্তাঘাটে কিশোরী ও নারীর অবমাননা, লাঞ্ছনা ও হেনস্থা, হুমকি-ধমকি ইত্যাদি। এসব ঘটনায় বিচারহীনতা এবং সমাজের পরোক্ষ সমর্থন, নারীর প্রতি প্রচলিত নেতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি কারণে কখনোই অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা পেতে দেখা যায় না। আর এসব বন্ধ করার জন্য কোনো জোরালো প্রতিবাদ বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগও লক্ষ করা যায় না।

সাম্প্রতিক সময়ে অ্যাসিড-সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ভুক্তভোগী, মানবাধিকারকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবকে দায়ী করছেন। দুই দশক পরেও অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। এধরনের মামলা দ্রুত বিচারের আওতায় আনার কথা থাকলেও আইনে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বিচার বা সাজা কোনোটাই হয় না। অ্যাসিড-সন্ত্রাস কমে গেছে এই ধারণার কারণে পুরানো মামলার নিষ্পত্তি, অ্যাসিড ব্যবহার বা ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর নজরদারি কমে গেছে। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক ভুক্তভোগী আপোস-মীমাংসার পথ বেছে নিচ্ছেন। গত তিন বছরে বিভিন্ন সংস্থার জরিপে দেখা গেছে আইনের শিথিলতা কিংবা সাক্ষী না পাওয়ার কারণে অ্যাসিড নিক্ষেপের প্রায় ৭০ শতাংশ ঘটনায় আসামীর শাস্তি হচ্ছে না। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড হলেও পুলিশ প্রতিবেদন যথাযথ না হওয়ায় অপরাধীরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে বা কম সাজা হচ্ছে। মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওয়া হলেও রায় কার্যকরা হচ্ছে না।

অ্যাসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সাল পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি নারী ও শিশু অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। এসব ঘটনায় ৭০০ জন গ্রেফতার হলেও ঘটনা অনুযায়ী বিচার সন্তোষজনক নয়। ১৯৯৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত অ্যাসিড-সন্ত্রাসে জড়িত অপরাধীদের মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ৩৩৪ জনের। এসব মামলায় খালাস পেয়েছেন ১ হাজার ৯১০ জন আসামি। মামলার আসামিদের ৮৮ ভাগ ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন। মাত্র ১২ শতাংশ আসামিকে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যাসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন আরেকটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ১৯৯৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৩ হাজার ৮৩৭ জন অ্যাসিডদগ্ধ হয়েছেন। ২০০২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ২ হাজার ১৬৯টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯টি মামলায় আসামীদের সাজা হয়েছে। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৯৫০ জন আসামি খালাস পেয়েছেন। নির্যাতনের শিকার নারীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার হার খুবই নগণ্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন বলছে মাত্র নয় শতাংশ মামলায় অপরাধীদের সাজা হয়েছে। গত ১৯ বছরে ১৪ জনের মৃত্যুদন্ডের রায় দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত কারো সাজা কার্যকর হয়নি।

আইনি ও বিচারিক এসব বিষয় ছাড়াও আমাদের জাতীয় অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের নিষ্ক্রিয়তাও অ্যাসিড-সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। অ্যাসিডের উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, অ্যাসিড আক্রান্তদের চিকিৎসা পুনর্বাসন ও আইনি সহায়তা নিয়ে প্রতি তিন মাস পর পর সভা করার কথা থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে এই কাউন্সিলের কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। অ্যাসিড বিক্রি ও ব্যবহারের ওপর জেলা পর্যায়ে জাতীয় অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের কোনো তদারকি নেই। ফলে এর অবাধ বিক্রি, উৎপাদন ও মজুদ ঠেকানো যাচ্ছে না বলে অ্যাসিড অনেকের কাছে সহজলভ্য হয়ে পড়েছে।

গত কয়েক বছরে অ্যাসিড-সন্ত্রাসের হার ধীরলয়ে হলেও বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের জন্য আশঙ্কার বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। অপরাধীরা যদি বুঝতে পারে যে অ্যাসিড-সন্ত্রাস করেও তারা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতে সক্ষম হবে, তাহলে তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠবে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত রাগ-ক্ষোভ মেটানোর জন্য যথেচ্ছভাবে অ্যাসিড-সন্ত্রাস ঘটানো শুরু করবে। এটি আমাদের সমাজে ভয়ঙ্কর একটি অবস্থার সৃষ্টি করবে। অ্যাসিড-সন্ত্রাস একটি ভয়াবহ অপরাধ। বিশেষ করে নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই অপরাধটি মানুষের জীবন, চেহারা, সৌন্দর্য্যও আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে তাকে জীবন্মৃত করে তোলে। এটি তার মনে, শরীরে ও জীবনে একটি দীর্ঘস্থায়ী দাগ ফেলে যায়, যা তাকে সারাজীবন বহন করে যেতে হয়। যেহেতু এর ক্ষত বাইরে থেকেও দেখা যায়, তাই সারাজীবন মানুষ এরজন্য সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে অথবা নিজেকে একেবারেই ঘরের মধ্যে বন্দী করে ফেলে। এই সহিংসতার শিকার ব্যক্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিচার পান না। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও মামলার খরচ চালাতে গিয়ে পরিবারগুলো নিঃস্ব হয়ে পড়ে। হামলার শিকার অনেকেই শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েন বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। পোড়া শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা সারাজীবন সহ্য করে যেতে হয়। পারিবারিক, সাংসারিক ও কর্মজীবনে টানাপোড়েন শুরু হয়। যতোই চিকিৎসা করা হোক না কেন, আক্রান্ত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক জীবন হয়তো আর কখনোই ফিরে পান না।

অ্যাসিড-সন্ত্রাস আবার পুরোদমে যেন শুরু না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য

আমাদের জরুরি ভিত্তিতে নিম্নোক্ত উদ্যোগ নিতে হবে:

♦ প্রথমেই প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

♦ অ্যাসিড-সন্ত্রাস প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক সংস্থাগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

♦ অ্যাসিড উৎপাদন, বিক্রি ও ব্যবহারের ওপর নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে।

♦ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনটি সম্পর্কে জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

♦ এ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণার কাজে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

♦ ভুক্তভোগীদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন, আইনি ও আর্থিক সহায়তা, কাউন্সেলিং, মানসিক সমর্থন ইত্যাদি বিষয়গুলোতে পরিষেবা ও সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

♦ সরকারকে অ্যাসিড অপরাধের বিচারাধীন এবং ভবিষ্যৎ মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আন্তরিক উদোগ নিতে হবে।



স্বাতী চৌধুরী*

কিশোরী কন্যার বিবাহ এবং আমাদের সামাজিক ভাবনার ভুলভুলাইয়া

সেই কতকাল আগে মহিয়সী রোকেয়া বলেছিলেন,'কন্যাগুলোকে সুশিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও, উহারা নিজেরাই তাহাদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিবে।' আমাদের সমাজের ঠিক কতজন রোকেয়ার এ বাণী জানেন তা জানি না। তবে এটা জানি যে আমাদের সমাজের অনেকেই জেনে হোক বানা জেনে হোক এ বাণীর আংশিক তাদের মেয়েদের জীবনে এখন প্রয়োগ করে। ঐ তারা মেয়েদের স্কুল-কলেজ-মাদরাসায় পাঠায়। সুশিক্ষা না হলেও শিক্ষা কিছুটা দেওয়ার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ছেড়ে দেয় না। বরং এরা যাতে কোনোভাবে ছাড়া না পায় তার জন্য বিবাহ নামের গাঁটছড়ায় এমনভাবে বেঁধে দেয় যে অল্প বয়সে সংসার নামের কারাগারে ঢুকে কিশোরী কন্যাগণের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সাধের অপমৃত্যু ঘটে। বিশেষ করে কন্যাশিশু বা কিশোরী কন্যাদের জীবনে বিবাহ যে একটা ভয়াবহ ফাঁস এ বিষয়টা আমাদের সমাজ আজো বুঝতেই পারে না।

অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ও বর্তমান সময়ের পর্যবেক্ষণ থেকে একথা অবশ্যই বলা যায় যে পরিবারে এখন কন্যাশিশুকে আগের থেকে অনেকটাই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটা কন্যাশিশুর পছন্দের খাবার, জামা-কাপড়, সাজ-সজ্জার জিনিসপত্রের আবদার মেটাতে পরিবার খুব একটা কৃপণতা করে না, যদি তাদের সাধ্য থাকে। এমনকি সাধ্য কম থাকলে মা-বাবা নিজেদের বঞ্চিত করে হলেও মেয়ের শখ আহ্লাদ পূরণ করে। এছাড়া এখন প্রায় প্রতিটি পরিবারই তাদের মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলে পাঠায়, অনেকে এরপর হাইস্কুলে এবং কলেজেও। অধিকাংশ বাবা-মা মেয়ের অসুখ হলে এখন সাধ্যমত চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে। তবু একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তারা এসব যাই করুক না কেন এখনো নব্বই শতাংশ অভিভাবকের মনে তাদের মেয়ের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ গন্তব্য শেষ পর্যন্ত মেয়েটার একটা বিয়ের মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো এমন সনাতনী ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই মেয়েকে যতই তারাস্কুল-কলেজে পাঠাক

*** কথাসাহিত্যিক ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা**

না কেন আসলে এখনো মেয়ের বয়স তেরো-চৌদ্দ বছর না হতেই তাদের মনের মাঝে মেয়ের বিবাহ নিয়েভাবনার মেঘঘোট পাকাতে থাকে। তাই মেয়েটা পড়াশোনা করছে বটে, কিন্তু মেয়ের পড়াটা আসলে তাদের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। মেয়েরা পড়ছে মানে যতদিন বিয়ে না হচ্ছে ততদিন পড়ুক; বিষয়টা হলো এরকম। তাতে ভাবনার ঘোট পাকানোর এই অসহ্য সময়টা পার করাও একটু সহজ হয়। সেজন্যই দেখা যায় বিয়ের পাত্র পাওয়া গেলেই মেয়ের লেখাপড়ার কথা আর কারো মাথায় থাকে না। আর আমাদের দেশের পাত্রপক্ষ ছেলেকে বিয়ে করিয়ে ঘরে বিনে মাইনের কাজের লোক চাইলেও কমবয়সী পাত্রীই তাদের পছন্দ। এরও একটা যুক্তিসংগত কারণ তাদের আছে। কমবয়সী মেয়েকে যেভাবে পরিচালনা করা যায় পরিণত বয়স্ক শিক্ষিত মেয়েদের সেভাবে যায় না। সেজন্যই পাত্র পক্ষের কাছে অধিক শিক্ষিত পাত্রীও খুব একটা কাঙ্ক্ষিত নয়। বিয়ের বাজারে কম বয়সী মেয়েদের চাহিদা বেশি বলেও অনেক মেয়ের বাবা কিশোরী মেয়ে বিয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে থাকে। এমন মনস্তাত্ত্বিক কারণে ঘটক ব্যাটা (এখন অবশ্য অনেক ঘটক বেটিও আছে) তাদের শ্যানদৃষ্টি রাখে সেসব পিতামাতার মনের ওপর যাদের বাড়িতে কিশোরী কন্যা আছে। এই ঘটক ঘটকীরা কিশোরী কন্যাদের বাড়িতে সকাল বিকাল আনাগোনা বাড়িয়ে দেয় আর মেয়ের মা বাপকে আকৃষ্ট করতে ছেলের বাপের এই সেই আছে, ছেলে সৌদি আরব, ওমান, দুবাই, কাতার, ইতালি বা সুইডেন থাকে বলে জোর গলায় প্রচার চালায়। বিয়ের বাজারে প্রবাসী পাত্রের চাহিদা বেশি থাকায় পাত্র প্রবাসী না হলেও তার ভাই বেরাদরেরা প্রবাসে আছে এবংতারা অচিরেই ছেলেকেও বিদেশ নিয়ে যাবে, এইতো ভিসা পাসপোর্ট হয়ে গেল বলে এমন টোপ দেখিয়ে কন্যার পিতামাতাকে লোভাতুর করে তোলে। এমন লোভনীয় প্রস্তাব শোনে কন্যার বাপের যেন আর তর সয়না। কত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে। একটু সচেতন বা একটু স্বপ্নবাজ মা বা তার কন্যার মৃদু প্রতিবাদে কন্যার পিতার মন যদিবা কিছুটা দুদূল্যমান হয়, তখন জ্ঞাতিগোষ্ঠী পাড়া পড়শী হৈ হৈ করে ওঠে–'আরে এমন পাগলামি কইরো না, মেয়ের বিয়া আইজ হোক কাইল হোক যখন দিতেই লাগব, তখন হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলা কী বুদ্ধিমানের কাজ হইব? আউগাও তুমি, দরকার লাগলে আমরা পেছনে আছি।' এভাবে আত্মীয়, পড়শী ও সমাজ একটা কিশোরী কন্যার বিয়ের পিঁড়িটা এগিয়ে দেয়, আর যে মেয়েটা লেখাপড়া করছিল, ভালো ছাত্রী হিসেবে লেখাপড়া নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল তার স্বপ্নে পানি ঢেলে দিয়ে সকল সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়। আসলে এ সমাজ এমন এক সমাজ যে এরা ভাবতে পারে না তাদের মেয়েটি লেখাপড়া শেষ করে অথবা উচ্চশিক্ষার সুযোগ যদি নাওবা পায়, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষেও বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যা শিখে বা ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজেকে এবং তার পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

ইদানিং স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের কথা অহর্নিশ শোনা যাচ্ছে। অথচ এখনো আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি একশ দেড়শ বছর পেছনের। যে কারণে একটি কন্যার মেধা-মনন বিবেচনায় তার মাঝে কোনো অমিত সম্ভাবনা আছে, তারসাথে সঙ্গতি রেখে তার শিক্ষালাভ, তার কর্মসংস্থান, তার পেশাগত জীবন কী হবে সে বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা না নিয়ে কন্যাটির পিতামাতাসহতার পরিবারকন্যার জন্মের পর থেকে কেবল তার বিবাহের পরিকল্পনাই করতে থাকে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এই পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে কী করে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে তা নিয়ে কেউ ভাবছে বলে তো মনে হয় না।

কিছুদিন আগে শোনা তেমন একটা পরিকল্পনার গল্প বলছি। আমাদের খুবই পরিচিত এক দিদি সেদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন– 'জানেননি দিদি, আমার ভাই মেয়ের জন্মের কিছুদিন পরেই মেয়ের নামে একটি ডিপিএস খুলেছিল।এখন মেয়ের বয়স পনেরো বছর, তাতেই দশলাখ টাকা জমে গেছে। আরও বছর দুয়েকের মধ্যে সেটা বারো-তেরো লাখ হবে।' নিজের স্বপ্নাদিকে খুশিতে ডগমগ লাগছিল। প্রতিবেশি দিদিও সে তারিফে সমর্থন জানিয়ে যখন প্রশ্ন করেন ঐ টাকা মেয়ের কোন কাজে ব্যবহৃত হবে তখনই থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়ে। বিষয়টা হলো মেয়ের বাবার এই জমানো টাকা মেয়ের বিয়ে নামক মহৎ কাজে ব্যয় করা হবে।

শুধু স্বপ্নাদির ভাই নয়, আমাদের সমাজে এরকম অনেক মেয়ের বাবা আছে এবং সমাজ তাদের তারিফ করে এ বিষয়ে অজ্ঞ অন্যান্য পিতাদের উৎসাহিতও করে।অথচ আমাদের স্বপ্নাদির ভাইঝি মাত্র ক্লাস টেনে পড়ে। স্বপ্নাদি বলেছিলেন, তার ভাইঝি লেখাপড়ায় খুব একটা মেধাবী নয় এবং দেখতে শুনতেও তেমন নয়, বিশেষ করে গায়ের রঙটাও কালো। সংগত কারণেই বিয়ের বাজারে তার দাম পড়তির দিকেই থাকবে। তাই কালোবরণ মেয়ের নিম্নবিত্ত পিতার ভরসা ঐ জমানো টাকায়। তার পরিকল্পনা বরকে কমচে কম নগদ পাঁচ লাখ যৌতুক আর বাকি টাকায় সোনাদানা ফার্নিচারসহ আনুষাঙ্গিক খরচ হয়ে গেলে বরযাত্রী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নটা ধার দেনা করে মিটিয়ে নেবে। আসলে মেয়ের বিয়ে নামক যুদ্ধ জয় করার এরকম পরিকল্পনা কেবল স্বপ্নাদির ভাইয়ের নয়। অধিকাংশ পিতা যাদের মোটামুটি আয় রোজগার আছে তারা খেয়ে না খেয়ে কন্যাদের বিয়ের জন্যে এভাবে যে যেমন পারে সঞ্চয় করে। কেউ টাকা সঞ্চয় না করতে পারলে সোনার অলঙ্কার গড়িয়ে রাখে, যাতে বিয়ের সময় অলঙ্কারের চিন্তা না করতে হয়। আর যারা টাকা সঞ্চয় বা অলঙ্কার গড়া এ দুটোর কিছুই করে উঠতে পারে না তারা কন্যাসন্তানের জন্মের পর থেকেই অহর্নিশ চিন্তার বোঝানিয়ে মাথা ভারাক্রান্ত করে তুলে। মেয়েকে নিয়ে এই চিন্তার বোঝাটা রূপান্তরিত হয়ে মেয়েটাই এক সময় তাদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং ঘাড়ের বোঝা যত তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য এমন মরিয়া হয়ে ওঠে যে পাত্র একটা

পেলেই হলো সে মাতাল না বদমাশ, ঊনবুদ্ধির নাকি ঊনপাজুরে তার খোঁজ নেওয়ার মতো ধৈর্য বা সময় কোনোটাই থাকেনা। একটা পাত্র যে তার মেয়েকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে সেটাকেই মেয়ের ও মেয়ের চৌদ্দগুষ্ঠির ভাগ্য মনে করে আত্মীয়,পড়শী, চেনা-অচেনা মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষার টাকায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলে। এরকম পরিস্থিতিতে দেখা যায় বিয়ের বছর না ঘুরতেই মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। কেউ কেউ হয়তো একটু দেরিতে ফেরে, তবে তখন তাদের কোলে একটা,হাতে একটা এবং পেটে আরেকটা বাচ্চা নিয়ে সেই পিতার বাড়িতেই ফিরে আসে।এ প্রসঙ্গে একটি সকরুণ হাসির গল্প মনে পড়ল বলে উপস্থাপন না করে পারলাম না।

গল্পটা লিপি ঋষি নামের একটি মেয়ের। তার বাবার তিন-চারটি মেয়ে। লিপি বড়। দিশেহারা বাবা তাকে যার কাছে বিয়ে দিয়েছিল সে খুব একটা সুস্থ ছিলনা। একদিন কাজ করলে দুদিন পারে না। একসময় সে এতো অসুস্থ হয়ে পড়ে যে তার আর কোনো কাজ করার ক্ষমতাই থাকে না। কিন্তু তাতে কী, ইতিমধ্যে লিপি দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং আবার আরেকটি সন্তান পেটে এসেছে। অথচ তার শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের খেতেও দেয় না। এমতাবস্থায় বাচ্চা দুটিকে নিয়ে লিপিকে পথে বের হতে হয়। কিন্তু সারাদিন ভিক্ষে করে চাল-ডাল যতটুকু সে নিয়ে আসে রান্না করে, তার অধিকাংশ খাবারই অসুস্থ বর খেয়ে ফেলে। ক্ষুধার্ত লিপি এনিয়ে দু-চার কথা বললে শাশুড়ি তাকে সারাদিন বকাঝকা করে, এমনকি অসুস্থ বরটাও তাকে মারধর করে। সহ্য করতে না পেরে লিপি চলে যায় বাপের কাছে।বাপের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ে। ঘাড়ের বোঝা কমাতে যে মেয়েকে সে বিয়ে দিয়ে বিদায় করেছিল সেই মেয়েই এখন আরও দু-তিনটে খাওয়ার মুখ নিয়ে ফিরে এসেছে। একটি নারী সংগঠনে অভিযোগ দিতে এসে সংগঠনের নেত্রীদের কাছে লিপি তার হাসি-কান্নার অবিমিশ্র অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেছিল– 'মাসী মণিরাগো, আমার আর আমার বাপের দুঃখের কথা কই। বাপ আমার একপোয়া চাউলের বরাদ্দ বাঁচাইবার লাইগ্যা যে মাইয়ারে বিয়া দিছিল, দেখো অখন হেই মাইয়া তিনপোয়া চাউল খাওনের মুখ নিয়া ফেরৎ আইছে।'

এই করুণ গল্প কেবল লিপি ঋষির নয়, আমাদের চারপাশে এমন শতশত লিপির দেখা মিলবে, যাদের বাপ খাওনের মুখ কমানোর জন্য মেয়েদের বিয়ে দেয় কিছুদিন পর সেই মেয়েরা অচিরেই দ্বিগুণ তিনগুণ খাওনের মুখ নিয়ে বাপের বাড়ি ফেরৎ আসে। বাপ যদি কর্মক্ষম থাকে কিছুদিন হয়তো কষ্টে সৃষ্টে তাদের খাওয়ায়, কিন্তু তারপর যখন পেটগুলো বড় হতে থাকে বাপও একদিন মুখ ঘুরিয়ে নেয় অথবা বাপের অসহায়ত্বের কথা ভেবে মেয়েটিই পথে বের হয়। দুদিনের বিবাহিত জীবনের ফসল-সন্তানদের মুখে দুটি ভাতের গ্রাস তুলে দিতে এবং নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তারা পাথর ভাঙা, মাটি কাটা, রাজমিস্ত্রির যোগালি না হয় পরের

বাড়ি কাজ করে অকালেই জীবন যৌবন শেষ করে ফেলে। আর সন্তানগুলো যদি মেয়ে হয় তো এদেরও পনেরো না পেরোতেই বিয়ে দিয়ে ঘাড়ের বোঝা নামানোর জন্য একদিন সে নিজেও অধৈর্য হয়ে ওঠে। পরিবার সমাজ তাকে ভয় দেখায় –মেয়ে বড় হইছে! আশেপাশে বখাটে ছেলের দল ওৎ পেতে থাকে। মান-সম্মান থাকতে বিয়ে দিয়ে ইজ্জত বাঁচানোর পরামর্শ ফেরি করে তারা মুফতে। এ অবস্থা যে কেবল লিপি ঋষিদের মতো প্রান্তিকের মধ্যে প্রান্তিকজনের তাও নয়। গ্রাম-শহরের আধা স্বচ্ছল বা মোটামুটি স্বচ্ছল গৃহস্থ বা ব্যবসায়ী পরিবারেরও একই চিত্র। এসব পরিবারের মেয়েরাও স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশোনায়ও ভালো, এদের অনেকেই স্বপ্ন দেখে আরও কিছুদূর পথ হাঁটার। কিন্তু পরিবারগুলোর কর্তা ব্যক্তিরা আর মেয়ের স্বপ্নকে ডানা মেলতে দেবে না। তারা মেয়ের জন্য কেবল একটি স্বপ্নই দেখে– সেটা হলো, একটি ভালো পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দেওয়া। আর ভালো পাত্র হলো সে, যার ভালো রোজগার আছে বা তার পিতার সহায় সম্পদ আছে। তারা আশা করে এরকম একটা পরিবারে মেয়েকে বিয়ে দিলে মেয়ে সুখে-শান্তিতে থাকবে। কিন্তু ঐ সুখ-শান্তি মানে যে তার কন্যার জন্য একটা দাসী বাঁদীর জীবনের নিশ্চয়তা করা সেটা তারা বুঝতেই পারে না বা বুঝতেও চায় না।

তাই দেখা যাচ্ছে, এই সমাজে কন্যাশিশুর জীবনটা এভাবে বিবাহের গোলক ধাঁধাঁতেই ঘুরপাক খেতে থাকে। একটি চৌদ্দ, পনেরো, ষোলোর কন্যাশিশু বিয়ের পরপরই যখন বছর না ঘুরতে আরেকটি কন্যাশিশুর মা হয়। সেই কন্যার বয়সও পনেরো-ষোলোর মধ্যে পৌঁছালে বিয়ে হয়ে যায় এবং আরেকটি কন্যাশিশুর জন্ম দেয়। এভাবে এক কন্যাশিশু থেকে আরেক কন্যাশিশু তার থেকে আরেক কন্যাশিশুর জীবনচক্র চলতেই থাকে।

কিন্তু কেন কন্যাশিশুটিকে বোঝা মনে করা হয়? আর যদি বোঝা মনে করাই হয়, তবে তাকে জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে আনতেই বা হয় কেন? এখন অনেক আধুনিক (অবশ্যই তথাকথিত) পিতামাতাকে দেখেছি দু-তিনটে ছেলে জন্ম হওয়ার পর একটি কন্যাসন্তানের আশায় ব্যাকুল হয়ে একের পর এক ছেলেসন্তানের জন্ম দিয়ে চলেছেন, যতক্ষণ না একটি কন্যার জন্ম হচ্ছে। কন্যাসন্তানের জন্য কেন এই ব্যাকুলতা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়– বয়স্কালে মায়া-মমতা ও সেবা-যত্ন পাওয়ার জন্য একটি কন্যাসন্তান প্রয়োজন। তাহলে এত আকাঙ্ক্ষা ও সাধনার ছেলেরা বয়সকালে কাজে আসেনা বলছেন? না,না তা হবে কেন?আসলে মায়া-মমতা মেয়েদের কাছেই তো বেশি থাকে, সেবা-যত্নও তারাই ভাল পারে কিনা। এমন উত্তর থেকেই সমাজে কন্যা বা মেয়েশিশুদের আসল মর্যাদা বা অবস্থানের চিত্রটা বোঝা যায়। আমাদের সমাজে কন্যাদের জন্ম হয় বা জন্মানো হয় অন্যলোকের সেবাযত্ন করার জন্য। আসলে মেয়েদের সেবাদাসী ভাবার যে প্রাচীন মানসিকতা সেখান থেকে এই সমাজ বেরিয়ে আসতে পারেনি। সে যতই

আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাক না কেন, অবচেতনে সেটাই লালন করে।

চেতনে হোক আর অবচেতনে হোক কন্যাশিশুকে সেবাদাসী ভাবা সমাজে কন্যার ভবিষ্যৎ তাই বিবাহ, শ্বশুরবাড়ির সেবাকাজ আর সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের মাঝেই অবিরাম ঘুরপাক খেতে থাকে। প্রায়শই শুনতে হয়– কথায় কথায় মা-বাবারা বলেন, মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে যখন বিয়ে তো একদিন দিতেই হবে। তাহলে আর আগে পরে কী? বরং আগে দেওয়াই ভালো। এদের কথা শুনে মনে হয় ছেলেদের যেন বিয়ে দিতে বা করাতে হয় না। আসল কথা হলো একটা মেয়ের বিয়ে তো একটা ছেলের কাছেই হয়! ছেলের বাবাকেও তাই মেয়ে খুঁজতে হয়। কিন্তু একজন কন্যার পিতা কন্যার বিয়ের জন্য যেমন দায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, পুত্রের পিতাকে তেমন হতে হয় না। তাই কন্যাদায় বলে শব্দ থাকলেও পুত্রদায় বলে কোনো শব্দ এ সমাজে নেই। সেজন্য পুত্রের পিতা পুত্রের বিবাহের ব্যাপারে নির্ভার থাকে। আর কন্যার পিতাকে কন্যার জন্মের পর থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। কিন্তু কন্যাকে নিয়ে এই দুশ্চিন্তার বোঝাতো তৈরি করে কন্যার পিতা ও তার পরিবার। তারা শুরু থেকেই মেয়েটাকে বোঝা হিসেবেই দেখে। চোখের সামনে হাজার হাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করে কিংবা সামান্য লেখাপড়া জেনেও যে হাতের কাজ শিখে একটু বুদ্ধি আর সাহসের জোরে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের ও পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে পারে তা দেখেও এখনো শতকরা নব্বইটি পরিবার ভাবতে অভ্যস্ত নয় যে তার কন্যাশিশুটিকে সুযোগ দিলে সে মা-বাবার দুশশ্চিন্তার কারণ না হয়ে বরং তাদের দুশ্চিন্তা দূর করার সামর্থ্য রাখবে। এই নব্বই শতাংশ পরিবারই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ছেলেদের সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য কেউ তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে একটা সরকারি-বেসরকারি চাকরি পাওয়ার ব্যবস্থা করে, কেউ তাদের জন্য জমি-জমা কেনে কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যবস্থা করে রাখে আর কেউবা বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু একটা কন্যাশিশুকে নিয়ে তারা এমন স্বপ্ন কখনও দেখে না, সেজন্য তাকে স্বাবলম্বী করার জন্য কোনো ব্যবস্থাও করে না।

স্বপ্নাদির ভাইয়ের মতো কন্যার পিতারা যারা মেয়ের জন্য বারো তেরো-লাখ টাকা সঞ্চয় করে এই টাকা দিয়ে তাদের মেয়েকে শিক্ষিত করে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অনায়াসে করে দিতে পারে। কিন্তু মেয়েটা ঘর-সংসার বাদ দিয়ে বাইরের কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করবে এই ভাবনাটাইতো তারা ভাবতে শেখেনি। তারা খালি একটাই চিন্তা করে–কীভাবে কখন কার কাছে মেয়েটাকে বিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য এ অবস্থার জন্য পরোক্ষভাবে সমাজও অনেকটা দায়ী। এ সমাজ কন্যাশিশুর পরিবারের ওপর অবিরাম খবরদারি করে কেন তার মেয়ের এতখানি বয়স হওয়ার পরও বিয়ে দিচ্ছে না? কেন তার মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে এত লেখাপড়া শেখাচ্ছে? মেয়েকে দিয়ে কি তারা চাকরি করাবে? কেন মেয়েকে নাচ-গান শেখাচ্ছে? কেউ কেউ আছে যারা এসব প্রশ্নকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু এত

প্রশ্নের চাপ অধিকাংশ কন্যার বাবা-মায়েরাই সহ্য করতে অভ্যস্ত নয়। তাই সমাজকে অগ্রাহ্য করতে পারেনা বলে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না।

তাহলে এই একবিংশ শতাব্দীর দু দশক পেরিয়ে আমরা যখন চাইছি একটা স্মার্ট দেশ, একটা স্মার্ট জাতি, সেটা কীভাবে সম্ভব যদি আমাদের চিন্তা-ভাবনার জায়গাটা স্মার্ট না হয়? আমরা ছেলেশিশু কন্যাশিশুতে বিভাজন করবো, কন্যাশিশুদের আটকে রাখবো শতশত বছরের আবর্জনাময় চিন্তার স্তুপ।তাদেরকে আমরা ছেলেদের সমান ভাবতে পারবো না, তাদের ওপর ভরসা করতে পারবো না, পরিবার-সমাজ-সংসার-রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার না দিয়ে তাদের কেবল সন্তান উৎপাদন ও সেবা কাজের মধ্যে আটকে রাখার মানসিকতা নিয়ে আর যাই হোক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া যায় না। সেটা করতে হলে আমাদের কন্যাশিশু, আমাদের কিশোরী কন্যাদের বিবাহের নিগড় থেকে বের করে তারা যেন পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় সেজন্য সমাজ মানস বদলাতে হবে। কন্যাদের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার সুযোগ দিতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে অধুনিক যুগপযোগী করতে হবে। ব্যাঙ্গের ছাতার মতো ঘরে ঘরে গজিয়ে ওঠা মাদরাসার শিক্ষা দিয়ে দেশে শিক্ষার হার বেড়ে গেছে বলে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালুসহ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। দেশের সিংহভাগ গরীব মানুষের কন্যারা শিক্ষাগ্রহণ শেষে কাজের সংস্থানের নিশ্চয়তা পেলে কন্যার পিতা-মাতাগণ কন্যাদের বোঝা মনে করা থেকে বেরিয়ে আসবে। সচেতন সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে অসেচতন সমাজের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর জন্য, যাতে তারা কন্যাদেরকে সন্তান উৎপাদনের মেশিন ও সেবাদাসী ভাবার মনোভাব পরিহার করে তাদের সুশিক্ষা প্রদানসহ স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করে। না হলে বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, তারপর আবার বিবাহ, আবার সন্তান উৎপাদনের গোলকধাঁধায় কেবল আমাদের কিশোরীগণই ঘুরপাক খাবে না, আমাদের সমাজও অবিরাম ঘুরতেই থাকবে।

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ কন্যাশিশু তথা নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে কর্মরত সমমনা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাজের সমন্বয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম। কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির জন্য এ ফোরাম-এর উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ফোরাম উদ্ভবের পটভূমি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু, যার মধ্যে ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু (‘জাতীয় ই-তথ্যকোষ’-এর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ কোটি ৩৯ লক্ষ জন কন্যাশিশু)। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এদের অধিকাংশই জন্ম থেকে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যকে সঙ্গী করেই বেড়ে উঠছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতায় কন্যাশিশুরা ছেলেশিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া কন্যাশিশুরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কন্যাশিশুর প্রতি প্রচলিত মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। আমাদের উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন যে, কন্যাশিশুরা শুধু ভবিষ্যৎ মা-ই নয়, তারা জাতির সম্পদ। কন্যাশিশুদের শারীরিক-মানসিক বিকাশ ও সুরক্ষা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং তাদের সম-অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপরই আমাদের জাতীয় অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করছে। তাই তাদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়াই হতে পারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

এই বিশ্বাসবোধ থেকে ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা ও তাদের বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০০ সালে সরকারের কাছে কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রস্তাব করে। এ প্রস্তাবে ৫৪টি বেসরকারি সংস্থা, কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। ফলে ঐ বছরের ৪ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনকে ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস’ ঘোষণা প্রদানের জন্য লিখিত প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন সরকার ৩০ সেপ্টেম্বরকে ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস’ পালনের ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণার ফলে ২০০০ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ফলে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সচেতনতা বাড়ছে। এই চেতনাকে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ২০০২ সালে ‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ গড়ে তোলা হয়।

ফোরাম-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য:

কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব, তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির জন্য ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণই ফোরাম-এর লক্ষ্য ।

উদ্দেশ্য:

- ✤ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র–সর্বস্তরে কন্যাশিশুর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে জনমত গঠন ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- ✤ কন্যাশিশুর সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুকূল নীতি-কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসি করা; এবং
- ✤ সরকারি-বেসরকারি সুযোগ ও সেবায় কন্যাশিশু ও নারীরঅভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

ফোরাম-এর কার্যক্রম:

'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' কন্যাশিশুদের সার্বিক জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সমগ্র বাংলাদেশে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে:

ক. অ্যাডভোকেসি: কন্যাশিশু ও নারীর অনুকূল আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে । এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা, সেমিনার, মানববন্ধন ও কর্মশালা পরিচালনা করা হয় ।

খ. প্রশিক্ষণ প্রদান: কন্যাশিশুদের জীবনভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে তারা নিজেদের সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ।

গ. কর্মশালা আয়োজন: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবী, সরকারি প্রতিনিধি ও অভিভাবকদের নিয়ে 'কন্যাশিশুর অধিকার ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করা হয় । বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে 'কন্যাশিশু সম্পদ, বোঝা নয়'– এ ধরনের ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ।

ঘ. গণসচেতনতা সৃষ্টি: জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবস পালন, পোস্টার, লিফলেট ছাপানো ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । যেমন, রচনা, চিঠি লেখা, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা । এছাড়া তৃণমূলে উঠান বৈঠক, শোভাযাত্রা, পথনাটক, গান ও অভিভাবক সমাবেশ পরিচালনা করা হয় ।

ঙ. আইনি সহায়তা: অ্যাসিড সন্ত্রাস-সহ নির্যাতনের শিকার হওয়া কন্যাশিশুদেরকে ফোরাম-এর সদস্য সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়।

চ. যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন: নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার নিয়ে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সমন্বয় সাধনপূর্বক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ফোরাম-এর অর্জনসমূহ

স্থানীয় পর্যায়ে

নারী-পুরুষের বৈষম্যের সংস্কৃতি আমাদের সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। কন্যাশিশুর প্রতি বঞ্চনা–এই বৈষম্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এর মূলোৎপাটন এবং কন্যাশিশুর বিকাশে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার কাজটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। অল্প সময়ে তাই দৃশ্যমান ফলাফল তৈরি করাটা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজে সকল স্তরের জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মূলত এ কাজটিই করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ফোরাম বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের দশ লক্ষাধিক নারী-পুরুষকে সম্পৃক্ত করেছে।

লক্ষণীয় যে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম এখন কন্যাশিশুদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বিগত সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সোচ্চার। প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন টকশো'র আয়োজন এবং কন্যাশিশুদের বঞ্চনা ও নির্যাতনের ওপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরি ও প্রদর্শন করায় জনসচেতনতা বাড়ছে। ফলে শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠছে। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় এবং প্রশাসনের সহায়তায় কয়েক সহস্রাধিক শিশুবিবাহ বন্ধ ও যৌতুকমুক্ত বিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে:

✤ জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসির ফলে ২০০০ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

✤ ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ১১ অক্টোবরকে 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস' ঘোষণা করা। এটি মূলত ফোরামেরই একটি অন্যতম অর্জন। কারণ কন্যাশিশুদের জন্য আলাদাভাবে একটি দিবস ঘোষণার জন্য জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম সর্বপ্রথম এবং দীর্ঘদিন ধরে অ্যাডভোকেসি-সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

✤ ফোরাম-এর সুপারিশের ফলে প্রথমবারের মত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন

নীতি-২০১১'-এর দ্বিতীয় ভাগে কন্যাশিশুর উন্নয়ন (ধারা ১৮) নামে একটি আলাদা ধারা সংযুক্ত করা হয়।

✤ 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়। ফোরাম-এর সুপারিশের ফলে এ নীতির মূলনীতিতে 'কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ' সংযোজন করা হয়।

✤ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' বাস্তবায়নকল্পে 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১২' তৈরির জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতে ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ ফোরাম সচিবালয় থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

✤ বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩০ নির্ধারণকল্পে ওয়ার্কশপ/কমিটি-তে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা।

✤ শিশু সুরক্ষা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটিতে ফোরামকে সদস্য হিসেবে রাখা।

✤ BCAS কর্তৃক আয়োজিত SAARC Framework for Child-Centered Disaster Risk Reduction (SARFCCDRR) and Adaptation বিষয়ক কমিটিতে ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা।

✤ 'ব্রিটিশ কাউন্সিল'-এর উদ্যোগে "Wellbeing, Prosperity and Communities: Library Services for Women and Families"-এর ওপর পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রে কাজ করছে ফোরাম।

✤ স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে 'গার্লস নট ব্রাইড অ্যালায়েন্স' ও 'চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ'-এর সাথে এবং যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন সার্ভিস (আইটিভিএস)' এবং'প্ল্যান ইন্ট্যারন্যাশনাল'-এর পরিচালনায় 'গার্লস অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স (জিএএ)' প্রজেক্ট-এর সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

✤ যৌন হয়রানি রোধে আলাদা একটি আইন তৈরির লক্ষ্যে উক্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং তা সংসদে পাস করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সাংগঠনিক কাঠামো দ্বি স্তর বিশিষ্ট:

ক) সাধারণ পরিষদ

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ।

সকল সাধারণ সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণে কেবলমাত্র সেই সকল সংগঠন বা ব্যক্তি আবেদন করতে পারবে যারা নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য ফোরাম-এর বিধিমালা মোতাবেক নির্বাচনে একটি করে ভোট দিতে পারেন।

প্রতি দু বছর পর সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে ফোরাম-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। কার্যনিবাহী পরিষদ মূলত সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, ফোরামে তিন ধরনের সদস্য রয়েছে যেমন, সাধারণ পরিষদের সদস্য, নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং দাতা সদস্য। সকল সদস্যই সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ফোরাম-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা কাঠামো চ্যাপ্টার কমিটি নামে পরিচিত। নির্বাহী কমিটির সহযোগিতা ও পরামর্শ সাপেক্ষে চ্যাপ্টার কমিটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই চ্যাপ্টার কমিটিসমূহ গড়ে ওঠে। এ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে ৩০টি; উপজেলা পর্যায়ে ৫২টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৮৫টি চ্যাপ্টার কমিটি গড়ে ওঠেছে।

প্রয়োজন আপনার সম্পৃক্ততা এবং নেতৃত্ব

চলমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কেবল নারী বা কন্যাশিশুর বিকাশের সুযোগই শুধু রুদ্ধ হয়ে পড়ছে না, এর পরিণতি ভোগ করছে সকল মানুষ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে। জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে কন্যাশিশুর জন্য সম-সুযোগ ও সম-বিকাশের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের এই আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আপনার ও আপনার সংগঠনের সম্পৃক্ততা জরুরি। আপনার অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও নিবেদিত প্রচেষ্টাই কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে কন্যাশিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করি এবং তাদের জন্য একটি সহিংসতামুক্ত ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

ফোরাম-এর অর্থায়ন:

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সদস্য সংগঠন, সহযোগী সংগঠন এবং ফোরাম-এর ব্যক্তিগত সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কন্যাশিশুদের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং তাদের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন এ ফোরামে বিনিয়োগ করে থাকেন। যার প্রতিদান হিসেবে তাঁরা দেখতে চান যথাযথ মর্যাদা, অধিকার এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে কন্যাশিশুরা চলাচল করছে এবং তাদের বিকাশের জন্য একটি

সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। যেটি মূলত ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ সৃষ্টির অন্যতম একটি পদক্ষেপ।

আপনি যে প্রক্রিয়ায় ফোরাম-এর সাথে যুক্ত হতে পারেন

আপনি ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত হতে পারেন। ফোরাম-এর সদস্যভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে সদস্য ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফর্মটি ফোরাম-এর সচিবালয় বা ফোরাম-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আবেদন ফর্মটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সদস্যপদ অনুমোদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ফোরাম কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। তাই আপনাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে ফোরাম-এর সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২/২ (লেভেল: ফোর), ব্লক: এ
মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ওয়েব: www.girlchildforum.org
ফেসবুক: www.facebook.com/ngcaf

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যে সকল প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	অপরাজেয় বাংলাদেশ
২.	একশনএইড বাংলাদেশ
৩.	ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ
৪.	কারিতাস বাংলাদেশ
৫.	উদ্দীপন
৬.	গুডনেইবারস বাংলাদেশ
৭.	ঢাকা আহছানিয়া মিশন
৮.	নারীমৈত্রী
৯.	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১০.	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ
১১.	অ্যাডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো
১২.	বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন
১৩.	এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন
১৪.	ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ
১৫.	কেয়ার বাংলাদেশ
১৬.	ব্র্যাক
১৭.	সঞ্চয়িতা সমাজকল্যাণ সমিতি
১৮.	মানবী
১৯.	ভ্রাতৃসংঘ
২০.	মা-শিশু সোসাইটি
২১.	এ্যলায়েন্স ফর কোঅপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (একলাব)
২২.	ফ্রয়েবল অ্যাডুকেশন অ্যান্ড স্কুল সোসাইটি
২৩.	ভয়েস অব ডেস্টিটিউট
২৪.	বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য চেইঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বিস্ক্যান)

২৫.	অর্ণব হেলথ অ্যাডুকেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৬.	ফর ইউ ফর এভার (ফাইফে)
২৭.	রাইটস অ্যান্ড সাইট ফর চিল্ড্রেন (আরএসসি)
২৮.	মায়ের ডাক
২৯.	গোর্কি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩০.	কাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩১.	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ সোসাইটি
৩২.	তরুণ ঐক্যজোট
৩৩.	ডেপ (ডেভেলপমেন্ট অ্যাডুকেশন অ্যান্ড পিস)
৩৪.	জেস ফাউন্ডেশন
৩৫.	অ্যাসোসিয়েশন টু এসিস্ট দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড (এ্যাসাপ)
৩৬.	শাহিনুর ফাউন্ডেশন
৩৭.	সেফ জেনারেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৩৮.	ন্যায়ের আলো সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ
৩৯.	সামাজিক উন্নয়নও পুনর্গঠন সংস্থা (সাড়া)
৪০.	সফর আলী ভূইয়া সংস্থা
৪১.	ভাটিয়ালি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
৪২.	অপরাজিতা নারী সংগঠন
৪৩.	চিলড্রেন অ্যান্ড আর্থ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৪৪.	সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর রুরাল ম্যাস
৪৫.	জননী সেবা সংস্থা
৪৬.	উদয়ন-বাংলাদেশ
৪৭.	আড়াই হাজার জন সংঘ (আজস)
৪৮.	সেবা মানিকগঞ্জ
৪৯.	সংযোগ
৫০.	সেবা

৫১.	সেন্টার ফর রুরাল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআরসিডি)
৫২.	নোয়াইল নারী কল্যাণ সমিতি
৫৩.	প্রভাটি এলিভিয়েশন ফর ইয়ুথ ইন বাংলাদেশ
৫৪.	ইয়ুথ এক্সিলেন্ট সোসাইটি-ইয়েস বাাংলাদেশ
৫৫.	দেওভোগ সমাজ উন্নয়ন সংসদ
৫৬.	সহিদ সেবা সংস্থা (এসএসএস)
৫৭.	পল্লী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (পি.ডি.এস)
৫৮.	ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজ পিপল (ডিডিপি)
৫৯.	সবুজ বাংলা উন্নয়ন সংস্থা (এসবিইউএস)
৬০.	তাজপুর নারী কল্যাণ সমিতি
৬১.	বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও হস্তশিল্প ফাউন্ডেশন
৬২.	সুচিতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
৬৩.	হাতকোপা মহিলা কল্যাণ সমিতি
৬৪.	বেলাভূমি কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বেলাভূমি)
৬৫.	বড়কুপট গণচেতনা ফাউন্ডেশন
৬৬.	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ফিউচার অ্যান্ড ইকোনমি
৬৭.	দোয়েল সংস্থা
৬৮.	ভুইগড় মহিলা কল্যাণ সমিতি
৬৯.	মৈত্রী মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৭০.	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
৭১.	বন্ধন সমাজ উনয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)
৭২.	এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)
৭৩.	ভয়েস অব সাউথ বাংলাদেশ
৭৪.	রুরাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৭৫.	দলিত
৭৬.	নো স্মোকিং ক্লাব

৭৭.	সামাজিক উন্নয়নও পুনর্গঠন সংস্থা (সাড়া)
৭৮.	শাপলা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা
৭৯.	হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (হেপি)
৮০.	পল্লী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (পি.ডি.এস)
৮১.	সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড ভিলেজ ইকোনকি (সেভ)
৮২.	ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৮৩.	দি প্রিপ ট্রাস্ট
৮৪.	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলাআইনজীবী সমিতি
৮৫.	প্ল্যান ইন্ট্যারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৮৬.	ব্রতী
৮৭.	কৈননীয়া
৮৮.	হীড বাংলাদেশ
৮৯.	সিসিডিবি
৯০.	অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)
৯১.	নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
৯২.	রুম টু রিড বাংলাদেশ
৯৩.	টিএমএসএস
৯৪.	ভূইয়া ফাউন্ডেশন
৯৫.	সোসাইটি ফর নলেজ প্রমোশন অ্যান্ড রিসার্চ (এসকেপিআর)
৯৬.	স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
৯৭.	ডনফোরাম
৯৮.	অপূর্ব মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.
৯৯.	আনন্দধারা বহুমুখী সমবায় সমিতি
১০০.	আমাদের প্রচেষ্টা
১০১.	ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
১০২.	এইচ. এস. অ্যাডুকেশন অ্যান্ড হেলথ সোসাইটি

১০৩.	চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
১০৪.	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
১০৫.	সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিল্ডেন স্ট্যাডিজ
১০৬.	স্যাপ-বাংলাদেশ
১০৭.	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ সেন্টার (বিডিপিসি)
১০৮.	এইচ. এস. অ্যাডুকেশন অ্যান্ড হেলথ সোসাইটি
১০৯.	অ্যাকশন ইন সোস্যাল ডেভলপমেন্ট
১১০.	আস্থা (আত্ম উন্নয়ন ও কল্যাণ সংস্থা)
১১১.	ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১১২.	কোডার
১১৩.	নেবুলা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
১১৪.	অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এআইডিএফ)
১১৫.	বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (বিডাব্লিউএইচসি)
১১৬.	চ্যারিটি ফাউন্ডেশন
১১৭.	সোসাইটি ফর আপগ্রেডিং রুরাল অ্যান্ড আরবান ইকোনমি (সিউর)
১১৮.	মায়ের হাসি
১১৯.	উপমা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (ইউপিএস)
১২০.	সোপান
১২১.	নাগরিক উদ্যোগ
১২২.	বিজয় ব্লাড ডোনেশন ক্লাব
১২৩.	নারী জাগরণ বহুমুখী সংস্থা
১২৪.	মীরপাড়া সমবায় সমিতি
১২৫.	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ফিউচার অ্যান্ড ইকনোমি (সেফ)
১২৬.	চেতনা মহিলা সংস্থা
১২৭.	অ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো)
১২৮.	দুঃস্থ বেকার কল্যাণ সমিতি

১২৯.	মহিলা উন্নয়ন সমিতি (মউস)
১৩০.	গোদনাইল সংস্থা
১৩১.	অর্গানাইজেশন অব এনভারমেন্টাল পলুশন প্রিভেনশন প্রোগাম (ওয়েপ)
১৩২.	কদমতলী নয়াপাড়া বহুমুখী সমবায় সমিতি
১৩৩.	পুর্বাশার আলো সমাজকল্যাণ সমিতি
১৩৪.	কল্যাণী সেবা প্রতিষ্ঠান
১৩৫.	স্পন্দন উন্নয়ন সংস্থা
১৩৬.	সাফ সংস্থা
১৩৭.	মুক্তাঙ্গন সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১৩৮.	একতা দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ সমিতি
১৩৯.	সপুরা দুঃস্থ মহিলা সমাজকল্যাণ সমিতি (এসডিএমএকেএস)
১৪০.	লাইফ সেন্টার (লোকাল ইনিশিয়েটিভ ফর এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার)
১৪১.	মুষ্টি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১৪২.	কাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
১৪৩.	নবজাগরণ সংস্থা (এনজেএস)
১৪৪.	টার্গেট পিপলস ফর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (টিপিডিএ)
১৪৫.	বাংলাদেশ পল্লী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা (ব্রীডস)
১৪৬.	দি রিজিওন্যাল রিপোর্টিং সোসাইটি
১৪৭.	রোজ সমাজকল্যাণ সংস্থা
১৪৮.	টিপরদী বহুমুখী গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.
১৪৯.	উদ্দীপক
১৫০.	সুখের নীড় বাংলাদেশ
১৫১.	বন্ধন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বিএসডিপি)
১৫২.	যুব সমাজের আলো
১৫৩.	বেকার কল্যাণ সংস্থা (বেকস)
১৫৪.	আপন ফাউন্ডেশন

১৫৫.	দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থা (দুকস)
১৫৬.	দেওভোগ সংঘ
১৫৭.	অগ্রগামী যুব সমাজ
১৫৮.	আশার আলো বাংলাদেশ
১৫৯.	আইলপাড়া জনকল্যাণ সমিতি
১৬০.	সাবজেক্ট হেলথ অ্যান্ড অ্যাডুকেশন ফাউন্ডেশন (সেফ)
১৬১.	নেটিভ ইভানজেলিকাল ক্রিশ্চিয়ান ট্রাস্ট
১৬২.	মৌচাক মহিলা সমাজকল্যাণ সমিতি
১৬৩.	হেল্প ফাউন্ডেশন
১৬৪.	ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন
১৬৫.	দুঃস্থ নারী ও কন্যার শাহারা সেন্টার
১৬৬.	লফস রাজশাহী
১৬৭.	ব্যাপ্টিস্ট এইড বিবিসিএফ
১৬৮.	প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
১৬৯	পল্লী একতা উন্নয়ন সংস্থা (রুডো)
১৭০	এইড অর্গানাইজেশন
১৭১	লোকাল আইডিয়া ফর এমপাওয়ারমেন্ট (লাইফ)
১৭২	সেভ দ্য চিল্ড্রেন ইন বাংলাদেশ

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

কার্যনির্বাহী পরিষদ-২০২৩-২০২৫

ক্রম	নাম	পদবি	সংগঠনের নাম
১.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সভাপতি	কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২.	জনাব শাহীন আক্তার ডলি	সহ-সভাপতি	নির্বাহী পরিচালক, নারীমৈত্রী
৩.	জনাব নাছিমা আক্তার জলি	সম্পাদক	পরিচালক (কর্মসূচি), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
৪	জনাব ওয়াহিদা বানু	সহ-সম্পাদক	নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ
৫	জনাব বীণা অধিকারী	কোষাধ্যক্ষ	প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, বাংলাদেশ ওয়াইডব্লিউসিএ
৬	জনাব মনোয়ারা বেগম	সদস্য	সভাপতি,একতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৭	জনাব রাজিয়া সুলতানা	সদস্য	হেড অব অ্যাডুকেশন অ্যান্ড হেলথ ইউনিট, গুডনেইবারস বাংলাদেশ
৮	জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য	সভাপতি, কদমতলী নয়াপাড়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৯	জনাব স.ম. মেহেদি হাসান	সদস্য	পরিচালক, লাইফ সেন্টার
১০	জনাব খোন্দকার সহিদুল আলম	সদস্য	পরিচালক, হেল্প ফাউন্ডেশন
১১	অ্যাডভোকেট নিষাত সীমা	সদস্য	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যেসকল ব্যক্তি যুক্ত আছেন

ব্যক্তির নাম
১. অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম চৌধুরী
২. অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন
৩. আলহাজ্ব উম্মে হাবিবা, প্রধান শিক্ষক, সফুর আলী ভুঞা উচ্চ বিদ্যালয
৪. অ্যাডভোকেট সেলিম খান, ব্যবস্থাপক, আর কে গ্রুপ
৫. আলহাজ্ব প্রিন্সিপাল আবুল বাশার (সমাজকর্মী)
৬. জনাব জাহিদুল হক খান (উন্নয়নকর্মী)
৭. জনাব লায়লা নাহার চৌধুরী (সমাজকর্মী)
৮. জনাব ইয়াসমিন আরা বেবী (উন্নয়নকর্মী)
৯. জনাব তাজিমা হোসেন মজুমদার (সংগঠক ও নারী উদ্যোক্তা)
১০. জনাব ফেরদৌসি আক্তার (সমাজকর্মী)
১১. জনাব ওয়াহিদা বানু স্বপ্না, নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ
১২. জনাব জোছনা খাতুন, কাউন্সিলর, সিটি কর্পোরেশন
১৩. ড. আলেয়া পারভীন, প্রফেসর, সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা
১৪. অধ্যাপক ইফফাত আরা নার্গিস,প্রাক্তন মহাপরিচালক,জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি(নায়েম)
১৫. ড. মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, গণস্বারক্ষতা অভিযান এবং সমন্বযকারী, সুপ্র
১৬. ডা. আসমা খাতুন
১৭. জনাব নাছিমা আক্তার জলি, পরিচালক (কর্মসূচি), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
১৮. জনাব লায়লা সাজিদ (সমাজকর্মী)
১৯. জনাব জাহানারা রহমান মনি (সমাজকর্মী)
২০. জনাব নীলুফার বেগম (উন্নয়নকর্মী)
২১. জনাব রেহেনা খাতুন, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
২২. জনাব বিলকিস নাহার (নারী উদ্যোক্তা)
২৩. জনাব মোস্তফা রহমান (উন্নয়নকর্মী)
২৪. জনাব মনিরুজ্জামান সরকার (সমাজকর্মী)
২৫. জনাব শাহিনা আক্তার (উন্নয়নকর্মী)
২৬. জনাব শামীমা মুক্তা (উন্নয়নকর্মী)
২৭. জনাব আমিনুল ইসলাম সুজন (লেখক ও সমাজকর্মী)
২৮. জনাব শফুরা বেগম (নারী উদ্যোক্তা)

জেলা কমিটি

বাগেরহাট জেলা কমিটি, বাগেরহাট	জয়পুরহাট জেলা কমিটি, জয়পুরহাট
বরিশাল জেলা কমিটি, বরিশাল	কুড়িগ্রাম জেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটি, চুয়াডাঙ্গা	লালমনিরহাট জেলা কমিটি, লালমনিরহাট
ঝিনাইদহ জেলা কমিটি, ঝিনাইদহ	নাটোর জেলা কমিটি, নাটোর
খুলনা জেলা কমিটি, খুলনা	পাবনা জেলা কমিটি, পাবনা
কুষ্টিয়া জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া	রাজশাহী জেলা কমিটি, রাজশাহী
মাগুরা জেলা কমিটি, মাগুরা	মাদারীপুর জেলা কমিটি, মাদারীপুর
নওগাঁ জেলা কমিটি, নঁওগা	ঝালকাঠী জেলা কমিটি, ঝালকাঠি
নড়াইল জেলা কমিটি, নড়াইল	মেহেরপুর জেলা কমিটি, মেহেরপুর
কক্সবাজার জেলা কমিটি, কক্সবাজার	ফরিদপুর জেলা কমিটি, ফরিদপুর
সাতক্ষীরা জেলা কমিটি, সাতক্ষীরা	কুমিল্লা জেলা কমিটি, কুমিল্লা
কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ জেলা কমিটি, ময়মনসিংহ
টাঙ্গাইল জেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	নেত্রকোণা জেলা কমিটি, নেত্রকোনা
রংপুর জেলা কমিটি, রংপুর	যশোর জেলা কমিটি, যশোর
নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি, নারায়ণগঞ্জ	মানিকগঞ্জ জেলা কমিটি, মানিকগঞ্জ
গাজীপুর জেলা কমিটি, গাজীপুর	খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি, চট্টগ্রাম

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি

উপজেলা কমিটি

বাবুগঞ্জ উপজেলা কমিটি, বরিশাল	কেন্দুয়া উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা
চৌদ্দগ্রাম উপজেলা কমিটি, কুমিল্লা	দুর্গাপুর উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা
শ্যামনগর উপজেলা কমিটি, সাতক্ষীরা	মির্জাপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
অভয়নগর উপজেলা কমিটি, যশোর	মধুপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
গুরুদাসপুর উপজেলা কমিটি, নাটোর	নাগরপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
বটিয়াঘাটা উপজেলা কমিটি, খুলনা	নান্দাইল উপজেলা কমিটি, ময়মনসিংহ
কাঠালিয়া উপজেলা কমিটি, ঝালকাঠি	চারঘাট উপজেলা কমিটি, রাজশাহী
পাঁচবিবি উপজেলা কমিটি, জয়পুরহাট	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
কটিয়াদী উপজেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ	কলমাকান্দা উপজেলা কমিটি, নেত্রকোনা
নাগেশ্বরী উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম	রৌমারী উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
গোপালপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	আটপাড়া উপজেলা কমিটি, নেত্রকোনা
সিংগাইর উপজেলা কমিটি, মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর উপজেলা কমিটি, কুষ্টিয়া
খোকসা উপজেলা কমিটি, কুষ্টিয়া	শরীয়তপুর সদর উপজেলা কমিটি, শরীয়তপুর
আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটি, বরিশাল	লাকসাম উপজেলা কমিটি, কুমিল্লা
মাদারীপুর সদর উপজেলা কমিটি, বরিশাল	মণিরামপুর উপজেলা কমিটি, যশোর
লক্ষ্মীগঞ্জ উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা	করিমগঞ্জ উপজেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ
মোহনপুর উপজেলা কমিটি, রাজশাহী	জাহাঙ্গীরপুর উপজেলা কমিটি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
বদরগঞ্জ উপজেলা কমিটি, রংপুর	ঘাটাইল উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটি, বরিশাল	লামা উপজেলা কমিটি, বান্দরবান
কালিহাতী উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	উল্লাপাড়া উপজেলা কমিটি, সিরাজগঞ্জ
খুবজীপুর উপজেলা কমিটি, নাটোর	মনিরামপুর উপজেলা কমিটি
গাংনী উপজেলা কমিটি, মেহেরপুর	ডুমুরিয়া উপজেলা কমিটি
পাংশা উপজেলা কমিটি	কালুখালি উপজেলা কমিটি

ইউনিয়ন কমিটি

মাধবপাশা ইউনিয়ন কমিটি
চাঁদপাশা ইউনিয়ন কমিটি
বাকাল ইউনিয়ন কমিটি
কেওড়া ইউনিয়ন কমিটি
উত্তরদা ইউনিয়ন কমিটি
মৈশাতুয়া ইউনিয়ন কমিটি
আদ্রা ইউনিয়ন কমিটি
ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন কমিটি
জাফরাবাদ ইউনিয়ন কমিটি
কাদিরজঙ্গল ইউনিয়ন কমিটি
ঘটমাঝি ইউনিয়ন কমিটি
দীঘি ইউনিয়ন কমিটি
পঞ্চসার ইউনিয়ন কমিটি
চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন কমিটি
চর ঈশ্বরদীয়া ইউনিয়ন কমিটি
কুষ্টিয়া ইউনিয়ন কমিটি
ভাবখালি ইউনিয়ন কমিটি
জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়ন কমিটি
সিংহের বাংলা ইউনিয়ন কমিটি
মৃগী ইউনিয়ন কমিটি
নিকরাইল ইউনিয়ন কমিটি
ঝাওয়াইল ইউনিয়ন কমিটি
দামিহা ইউনিয়ন কমিটি
বেতাগা ইউনিয়ন কমিটি
ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন কমিটি
দুর্বাডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিটি

রহমতপুর ইউনিয়ন কমিটি
দেহেরগাতি ইউনিয়নকমিটি
রাজিহার ইউনিয়ন কমিটি
কীর্তিপাশা ইউনিয়ন কমিটি
আজগড়া ইউনিয়ন কমিটি
ঝলম উত্তর ইউনিয়ন কমিটি
হেসাখাল ইউনিয়ন কমিটি
কোনাখালী ইউনিয়ন কমিটি
গুজাদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
দেহুন্দা ইউনিয়ন কমিটি
পিয়ারপুর ইউনিয়ন কমিটি
গড়পাড়া ইউনিয়ন কমিটি
রামপাল ইউনিয়ন কমিটি
খাগডহর ইউনিয়ন কমিটি
বয়ড়া ইউনিয়ন কমিটি
দাপুনিয়া ইউনিয়ন কমিটি
ঘোগা ইউনিয়ন কমিটি
চল্লিশা ইউনিয়ন কমিটি
পাট্টা ইউনিয়ন কমিটি
ফলদা ইউনিয়ন কমিটি
অলোয়া ইউনিয়ন কমিটি
হেমনগর ইউনিয়ন কমিটি
দিগদাইড় ইউনিয়ন কমিটি
শুভদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
মনোহরপুর ইউনিয়ন কমিটি
জলমা ইউনিয়ন কমিটি

বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন কমিটি
বড়খাদা ইউনিয়ন কমিটি
মটমুড়া ইউনিয়ন কমিটি
তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কমিটি
সাহারবাটি ইউনিয়ন কমিটি
ধানখোলা ইউনিয়ন কমিটি
মৃগী ইউনিয়ন কমিটি
সাহস ইউনিয়ন কমিটি
শোভনা ইউনিয়ন কমিটি
রুদাঘরা ইউনিয়ন কমিটি
বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন কমিটি
দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়ন কমিটি
মিঠাখালী ইউনিয়ন কমিটি
রায়েন্দা ইউনিয়ন কমিটি
ফকিরহাট ইউনিয়ন কমিটি
খুবজীপুর ইউনিয়ন কমিটি
পত্নীতলা ইউনিয়ন কমিটি
দিবর ইউনিয়ন কমিটি
মাটিন্দর ইউনিয়ন কমিটি
পাটিচড়া ইউনিয়ন কমিটি
ঘোষনগর ইউনিয়ন কমিটি
শিহাড়া ইউনিয়ন কমিটি
দুলাই ইউনিয়ন কমিটি
মৌগাছি ইউনিয়ন কমিটি
জাহানাবাদ ইউনিয়ন কমিটি
সরদহ ইউনিয়ন কমিটি

বাট্টাইল ইউনিয়ন কমিটি
ষোলটাকা ইউনিয়ন কমিটি
বামুন্দী ইউনিয়ন কমিটি
কাজিপুর ইউনিয়ন কমিটি
কাথুলী ইউনিয়ন কমিটি
রায়পুর ইউনিয়ন কমিটি
পাট্টা ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরখালী ইউনিয়ন কমিটি
খর্ণিয়া ইউনিয়ন কমিটি
রঘুনাথপুর ইউনিয়ন কমিটি
কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন কমিটি
মৌতলা ইউনিয়ন কমিটি
বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিটি
সাউথখালি ইউনিয়ন কমিটি
বাহিরদিয়া মনসা ইউনিয়ন কমিটি
ধারাবারিষা ইউনিয়ন কমিটি
নিরমইল ইউনিয়ন কমিটি
আকবরপুর ইউনিয়ন কমিটি
কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন কমিটি
নজিরপুর ইউনিয়ন কমিটি
আমাইড় ইউনিয়ন কমিটি
মহাদেবপুর ইউনিয়ন কমিটি
সাগরকান্দি ইউনিয়ন কমিটি
ধুরইল ইউনিয়ন কমিটি
বাকশিমইল ইউনিয়ন কমিটি
ভায়ালক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন কমিটি

খালিশাচাপানী ইউনিয়ন কমিটি
কোলকোন্দা ইউনিয়ন কমিটি
বেতগাড়ি ইউনিয়ন কমিটি
চতরা ইউনিয়ন কমিটি
মিরপুর ইউনিয়ন কমিটি
বাহুবল ইউনিয়ন কমিটি
গোপায়া ইউনিয়ন কমিটি
লস্করপুর ইউনিয়ন কমিটি
নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন কমিটি
পুটিজুরী ইউনিয়ন কমিটি
দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়ন কমিটি
পশ্চিম পাগলা ইউনিয়ন কমিটি
পাথারিয়া ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরখালী ইউনিয়ন কমিটি
ডুমুরিয়া ইউনিয়ন কমিটি

নোহালী ইউনিয়ন কমিটি
লক্ষীটারী ইউনিয়ন কমিটি
গজঘণ্টা ইউনিয়ন কমিটি
কাবিলপুর ইউনিয়ন কমিটি
সিংচাপৈর ইউনিয়ন কমিটি
সাতকাপন ইউনিয়ন কমিটি
নিজামপুর ইউনিয়ন কমিটি
পৈল ইউনিয়ন কমিটি
গঙ্গাচড়া ইউনিয়ন কমিটি
আলমবিদিতর ইউনিয়ন কমিটি
চরমহল্লা ইউনিয়ন কমিটি
দরগাপাশা ইউনিয়ন কমিটি
ফেনারবাগ ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরঘোনা ইউনিয়ন কমিটি
আটলিয়া ইউনিয়ন কমিটি
জামালগঞ্জ ইউনিয়ন কমিটি

বিনিয়োগে অগ্রাধিকার
কন্যাশিশুর অধিকার







